আমি চঞ্চল হে

চিত্রগুপ্ত

চণ্ডিকা প্রকাশক :: পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
:: ১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীতপনকুমার চৌধুরী
১২, কর্নওআলিস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ : মহালয়া, ১৩৬৭

মুদ্রক
শ্রীতুর্গাপদ ঘোষ
রূপলেখা প্রেস
২৮এ, কালিদাস সিংহ লেন
কলিকাতা-৯

দাম তিন টাকা

স্বর্গত পিতৃদেবের স্মরণে

জীবন নিয়েই উপন্যাস। যে কাহিনী জীবন-ধর্মী নয়, রসের পরীক্ষায় তা উত্তীর্ণ হতে পারে না। সাহিত্যের বিচারে তার মূল্য যায় কমে। আজকের সমাজ-জীবনে বাঁচার দাবিতে একটি মেয়ের সংঘাতময় সংগ্রাম এই কাহিনীর মূল সুর। এই কাহিনীর মধ্যে যেসব চরিত্রের আসা-যাওয়া তাদের দেখে হয়ত চেনাশোনার বাইরে মনে হবে না। কিন্তু তারা সকলেই আমার কল্পনা-প্রসূত। পার্থিব কোন নরনারীর সঙ্গে এদের কোন যোগ নেই।

কলিকাতা
মহালয়া, ১৩৬৭ সাল।

লেখক

এই লেখকের

জীবন বিচিত্রা

॥ এক ॥

আজব নগরী কলকাতা। এর একদিকে প্রাচুর্য আর একদিকে দৈন্য। একদিকে আলো আর একদিকে অন্ধকার। রাত্রি এখানে কোথাও রূপসী কোথাও ক্রন্দসী। পাশাপাশি দুস্তর ব্যবধান। চৌরঙ্গীতে যখন মনে হয় সন্ধ্যা হয়নি, বিশ্বনাথ মতিলাল লেনে তখন রাত্রির স্তব্ধতা। এমনি এক অন্ধ গলিতে জরাজীর্ণ এক বাড়ির ভাঙা ঘরে এ কাহিনীর শুরু।

কঙ্কালসার দেহে শুয়ে আছেন হরিনারায়ণ। ভাঙাচোরা আসবাব-পত্রে গোছানো ঘরখানি। দুরারোগ্য অ্যাজমা রোগে আক্রান্ত তিনি প্রায় দুবছর। রোগের ক্লান্তি আর দারিদ্র্যের নিষ্করুণ চিহ্ন ফুটে উঠেছে তাঁর সারা দেহে। সকাল বেলাতেও সূর্যের আলো প্রবেশের পথ পায়নি তাঁর ঘরখানায়। সওদাগরী অফিসের কেরানীর পক্ষে যতটা সম্ভব, তার সবটুকুই তিনি চেষ্টা করেছেন সুস্থতার জন্যে। কিন্তু এতদিনেও রোগের কোন উপশম হল না।

সংসারটা তাঁর খুব বড় না হলেও খুব ছোট নয়। অভাবের সংসারে জীবনভর সংগ্রাম করেও সঞ্চয় কিছুই করতে পারেন নি। সোনা-দানা বা অল্পস্বল্প নগদ যা কিছু ছিল তাও প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে রোগের সঙ্গে দুটো বছর যুদ্ধ করতে। আগামী দিনের সারা সংসারটার অনশনক্লিষ্ট চেহারাটার কথা ভেবে আরও যেন ভেঙে পড়েন হরিনারায়ণ। ভীষণ কাশির বেগ আসে ভাবতে ভাবতে। ছুটে প্রবেশ করে অন্নপূর্ণা। বলে : বাবা, আবার কি কাশির বেগ এল?

একটু সামলে নিয়ে হরিনারায়ণ বলেন : হ্যাঁ মা। আমি যে আর পারছি না।
দুফোঁটা তপ্ত চোখের জল গড়িয়ে পড়ল তাঁর চোখ দিয়ে। সে অশ্রু বেদনার। সে অশ্রু বঞ্চনার। রণক্লান্ত মানুষের পরাজয়ের অশ্রু। ধীরে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে অনুরূপা। চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকেন হরিনারায়ণ।
ছোট সংসারে স্ত্রী করুণা এক সর্বংসহা নারীর প্রতিমূর্তি। প্রাচুর্যের মধ্যে ছোটবেলায় মানুষ হয়েছিলেন তিনি। তারপর কৈশোরের প্রান্তে এসে মধ্যবিত্ত হরিনারায়ণের সংসারে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন নিজেকে। মোটা ভাত মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট থেকে কর্তব্যনিষ্ঠ স্ত্রী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সে সংসারে। সন্তান তাঁর দুটি। মেয়ে অনুরূপা রূপলাবণ্যে অসামান্যা। ছাত্রী হিসাবেও মেধাবিনী। বয়স তার একুশ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে কিন্তু অর্থ ও সুযোগের অভাবে পাত্রস্থ করা হয়ে ওঠে নি। দুবছর আগে আই. এ. পরীক্ষার জন্যে যখন সে প্রস্তুত হচ্ছিল তখনই শয্যা নিলেন হরিনারায়ণ। জীবনযাত্রার দৈনন্দিন প্রয়োজনে টান পড়ল। কলেজে পড়া তখন বিলাস। তাই দীর্ঘ দুটি বছর বাবার সেবা করেই কাটছে অনুরূপার। ক্ষুরধার তার বুদ্ধি। লক্ষণীয় তাব ব্যক্তিত্ব। বিচক্ষণতা আর সহনশীলতা প্রশ্নাতীত।
ধীরে ধীরে বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় অনুরূপা। সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিতে হয়ত ভাবে অনাগত ভবিষ্যতের কথা। নিমীলিত চোখে মাঝে মাঝে কাতর আর্তনাদ করেন হরিনারায়ণ। সান্ত্বনা দিয়ে অনুরূপা বলে : ভেবো না বাবা, আস্তে আস্তে কমে যাবে।
: আস্তে আস্তেই কমে যায় পৃথিবীর সব শক্তির উৎস। দীপের শিখাও তো আস্তে আস্তেই নিভে যায় মা।
খুব কাতরভাবে কথাগুলো উচ্চারণ করেন হরিনারায়ণ।

অনুরূপা ব্যথা পায় বাবার কথায়। তবুও ধমকের সুরে বলে ঃ বাবা, তুমি ভয়ানক বাজে কথা বল। চুপ করে শুয়ে থাকো। আমি তোমার জন্যে চা নিয়ে আসি।

ম্লান হাসেন হরিনারায়ণ। অনুরূপা চলে যায়। হরিনারায়ণের মনটা আবার সাঁতার দিতে থাকে চিন্তার অকূল সাগরে। এই ক্ষয়িষ্ণু সংসারটাকে চালিয়ে নিয়ে যাবার কি আর কোন উপায় নেই? সত্যিই নেই। আঘাতে সংঘাতে অবিচলিতা করুণা পাষাণ-প্রতিমা। সবচেয়ে বড় ভাবনা অনুরূপা। আর তার চেয়েও বড় ভাবনা অরূপ। পনেরো পেরিয়ে ষোলয় পা দিয়েছে সে। কাপড়ের অভাবে এখনও হাফপ্যান্ট পরেই কাটাতে হয় তাকে। একটা বছর পরে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেবে সে। অনেক চেষ্টা করেও এ সব ভাবনা মন থেকে দূর করতে পারেন না হরিনারায়ণ।

চা নিয়ে অনুরূপা প্রবেশ করে। চা খেতে খেতে হরিনারায়ণ জিজ্ঞাসা করেন ঃ খোকন কোথায় রে?

ঃ সে ডাক্তারবাবুকে ডাকতে গেছে বাবা। অনুরূপা জবাব দেয়। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হরিনারায়ণ বলেন ঃ ডাক্তার আবার কেন? ডাক যখন মানুষের আসে, ডাক্তার ঠেকিয়ে রাখতে পারে না সে ডাক। বৃথা টাকা খরচ করে পরপারের পরোয়ানাকে রুখতে যাওয়া শুধু বোকামি।

সে কথা শুনে অনুরূপারও চোখে জল আসে। কিন্তু কোন প্রতিবাদ করতে পারে না সে। মৃত্যুশীতল এক নীরবতার মাঝে চুপ করে বসে থাকে শুধু পিতা আর কন্যা। সেই নীরবতা ভাঙে যখন ছুটে আসে অরূপ। বলে ঃ বাবা, তোমার নামে রেজিস্টারি চিঠি এসেছে।

কাঁপা হাতে চিঠিখানা নিয়ে পড়তে পড়তে হরিনারায়ণের মুখটা বিবর্ণ পাংশু হয়ে যায়। সে চিঠিতে ছিল চাকরি চলে যাওয়ার সংবাদ। অফিসের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার বারতা বহন করে নিয়ে এসেছিল সেই একটুকরো কাগজ। অনুরূপা বুঝেছিল। বুঝতে

পেরেছিল সেই নিষ্ঠুর সংবাদ। আর সেই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে দুরন্ত কৌতূহল নিয়ে দাঁড়িয়েছিল অরূপ বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে।

ঠিক সেই সময়ে ঘরে ঢোকেন করুণা। সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি উপলব্ধি করেন একটা কিছু অঘটন ঘটেছে। একটা কোন দুঃসংবাদ চিন্তার কালিমা মাখিয়ে দিয়েছে তাদের মুখে। স্বামীর ও মেয়ের মুখের দিকে তাকান তিনি। সে দৃষ্টিতে ছিল শুধু জিজ্ঞাসা।

ঃ বড় সুখের সংবাদ। চাকরিটা গেছে। হরিনারায়ণ বলেন।

অনুরূপা বলে ঃ কিন্তু বাবা, তোমার এতদিনের নিষ্ঠা —

তাকে থামিয়ে দিয়ে ম্লান হেসে হরিনারায়ণ বলেন ঃ নিষ্ঠা! কী মূল্য আছে তার? ওরা জানে বেতো ঘোড়াকে চাবুক মারলেও সে আর দৌড়তে পারবে না। শোষণ করে সমৃদ্ধ যাদের ব্যবসা, তোষণ-নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত যাদের মর্যাদাবোধ, তারা যে দুটি বছর আমাকে রেখেছে সেইটাই বড় কথা।

ঃ সে কথা থাক বাবা। তোমার ওষুধ খাবার সময় হল।

কথাগুলো বলে অনুরূপা এগিয়ে আসে অরূপের কাছে। অরূপ বোঝে দিদি একটা কিছু বলবে। কিন্তু সে উক্তির আগে হতাশায় ভরে যায় তার মুখটা।

অনুরূপা জিজ্ঞাসা করে ঃ বাবার ওষুধ এনেছিস?

দুঃখিতভাবে অরূপ জবাব দেয় ঃ দাম না পেলে কম্পাউণ্ডারবাবু আর ওষুধ দেবেন না বলেছেন।

একথা শুনতে পেয়েছেন হরিনারায়ণ। শুনতে পেয়েছেন করুণা। আর তাই ভেবে সবচেয়ে অপ্রস্তুত হয়েছে অনুরূপা। তার সে ভাব বুঝতে পেরে কান্নার আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে অরূপের। কিশোর মনে সমস্ত পরিস্থিতিটা একটা নিদারুণ বেদনার সঞ্চার করে। হয়ত সে ভাবে এই অসহনীয় দারিদ্র্যের হাত থেকে কি মুক্তি নেই? নিষ্কৃতি নেই কি দিনগত এই সংসারযাত্রার গ্লানি থেকে?

ছলছল চোখে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যায় অরূপ।

॥ দুই ॥

আজব নগরী কলকাতারই একাংশে হোটেল গ্রীণ। সবুজের সমারোহ সেখানে কতখানি জানি না। কিন্তু চোখ ঝলসানো তার আলোর মাঝে জমা আছে অনেক কালো। প্রতিটি চেয়ার টেবিল ইঁট কাঠ আর কাঁচের গ্লাস অনেক মর্মস্পর্শী নাটকের নীরব সাক্ষী। এর ভেতরে বসে বোঝা যায় না দিনের পরে রাত্রি আছে। জানা যায় না এদেশে মানুষ অর্থাভাবে অভুক্ত থাকে। অনুভব করা যায় না দেশের কোন অর্থনৈতিক সঙ্কট। সুরা সাকী নাচ আর গান। তাই-ই যদি জীবন হয় হোটেল গ্রীণ তাহলে সত্যিই সবুজ। যত কালোই থাক তার ভেতরে। বিলাতী কায়দায় সুসাজ্জিত হোটেল। ছোট ছোট টেবিল চেয়ার সুবিন্যস্তভাবে সাজানো। বিচিত্র বেশ-ভূষায় বিভিন্ন নরনারীর সহাস্য কলগুঞ্জনে মুখরিত। তাদের মধ্যে নাম করার মত ব্যাক্তি প্রতাপগড়ের কুমার বাহাদুর, ব্যারিস্টার শান্তনু রায়, নেপালের রাজকর্মচারী জীতবাহাদুর সিং, প্রখ্যাত হাইড মার্চেন্ট লিন্ ফও প্রভৃতি। একটি টেবিলে বসে ছিল অ্যাডভোকেট বজ্রপানি সিন্‌হা, অতনু মল্লিক আর হোটেলের মালিক রামলাল গোয়েঙ্কা। বাজনার তালে তালে নাচছিল গোয়ানিজ একটি মেয়ে।

অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ রামলাল গোয়েঙ্কা। জীবনে পাপ পুণ্যের বিচার সে কোনদিন করেনি। পাপের পথে অর্থ উপার্জন করে রাধাকিষণের স্মরণে আর দৈনন্দিন গঙ্গাস্নানে সব পাপ ধুয়ে ফেলতে চায় সে। জগতে কামিনী আর কাঞ্চনের মধ্যে কাঞ্চনকেই সে বেছে নিয়েছে। অবশ্য

কাঞ্চনের আশায় কামিনীকে কাজে লাগাতে পেছপা হয়নি সে। ভোগের জন্যে কামিনী তার কাছে কত দামের সে খবর সকলেরই অজানা। হোটেল গ্রাণ-এর আসল মালিক রামলাল। হোটেলের কারবার ছাড়া তার আছে আরও অনেক গোপন কারবার। তার সব কাজে আইনের পরামর্শদাতা বন্ধুস্থানীয় বজ্রপানি সিন্‌হা। সব পাপ কাজের একমাত্র সহকারী অতনু মল্লিক।
একটা টেবিলে তিন জনে বসে পরামর্শ হচ্ছিল। সুরার রঙীন পাত্র নিঃশেষ করছিল বজ্রপানি আর অতনু। রামলাল প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলছিল তাদের সঙ্গে। ক্রমে রাত বেড়ে ওঠে। হোটেল বন্ধ হবার সাঙ্কেতিক চিহ্ন হিসাবে মৃদু ঘণ্টা বাজে আর দরজার মাথায় লাল আলোটা একবার জ্বলে একবার নেভে।
গোয়ানিজ নর্তকী লীলায়িত দেহবল্লরীতে কামনার ঢেউ তুলে নেচে চলছিল এতক্ষণ। নাচ থামিয়ে শরীরটাকে যথাসম্ভব দুলিয়ে হাসিমুখে এগিয়ে আসে কুমার বাহাদুরের কাছে।
ঃ কেমন লাগল কুমার বাহাদুর? প্রশংসার আকাঙ্ক্ষা তার চোখে।

নেশায় আচ্ছন্ন কুমার বাহাদুর রক্তাভ চোখ তুলে নর্তকীর সারা দেহ দেখতে থাকেন। জড়িত গলায় বলেন ঃ মন্দ নয়।
একটি মোসাহেব ছিল কুমার বাহাদুরের সঙ্গে। নাচ তার খুব ভাল লেগেছিল। তার চেয়েও ভাল লেগেছিল নর্তকীকে। কুমার বাহাদুরের সংক্ষিপ্ত জবাবে সন্তুষ্ট হতে পারেনি সে। খোসামোদের সুরে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলে ঃ শুধু মন্দ নয় কেন স্যার! বলুন চার্মিং। সে কথায় সায় না দিয়ে পারেন না কুমার বাহাদুর। মাথা নাড়তে নাড়তে আর একবার আঁখিবাণে বিদ্ধ করেন নর্তকীকে। সুযোগ বুঝে মোসাহেবের দিকে তাকিয়ে নর্তকী বলে ঃ তাহলে তো কিছু বকশিশের দাবি নিশ্চয়ই করতে পারি।

কুমার বাহাদুর ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে দেন তাঁর সঙ্গীর কাছে। সেটি খুলে দুটি টাকা সে দেয় নর্তকীর হাতে। সেলাম জানিয়ে নর্তকী স্থান ত্যাগ করে। সঙ্গীকে নিয়ে টলতে টলতে নিষ্ক্রান্ত হন কুমার বাহাদুর। অন্যান্য লোকও তখন একে একে বেরিয়ে যেতে শুরু করেছে।

বাজনা থেমে গেছে। নাচও বন্ধ। একে একে বিদায় নিয়েছে সবাই। শুধু এককোণে নর্তকী বসে আছে। বাইরে তখন টিপ টিপ বৃষ্টি। কতকগুলো ওয়েটার এক কোণে বসে। অতনু ডাক দেয়ঃ এই বয়। তিন পেগ হুইস্কি লে আও। স্কচ হুইস্কি।

রামলাল বলেঃ তুমি এখনও খাবে?

ঃ জানোত, তোমারই কাজে গত পাঁচদিন আমার কী পরিশ্রম হয়েছে। একটু আরাম তো চাই।

ঃ আজকে আরাম করে নাও। কাল থেকে আবার কাজ। অতনুর তখন নেশা ধরে গেছে। চোখ মুখ থমথম করছে তার। ঝোঁকের মাথায় অতনু বলেঃ আরাম আমার হয়ে গেছে। শক্ত কাজ যদি কিছু থাকে তো বলো রামলাল।

রামলাল করণীয় কিছু চিন্তা করতে থাকে। বজ্রপানি একমুখ সিগারেটের ধোঁওয়া ছেড়ে বলেঃ আমি ভাবছি এমন কোন কাজ আছে কি না যা ও করতে পারে না।

ঃ আছে ও ভালবাসতে পারে না।

হাসতে হাসতে নর্তকী এগিয়ে আসে কথাগুলো বলতে বলতে। সে কথায় বজ্রপানি আর রামলাল হাসতে থাকে। শুধু চুপ করে বসে থাকে অতনু। নর্তকী ওদের দলের গুপ্তচরের কাজ করে। অনেক সময়ে অনেক গোপন সংবাদ দেয়। তাই তার এই বিদ্রূপটা কোন-মতে হজম করে অতনু বলেঃ বাজে ইয়ার্কি রাখো। কাজের কথা

বলো।আজ কোন নতুন শিকার জুটল ?

: কেন ? একটু আগেই তো এক লাখপতি এসেছিল এখানে।

: কে সে ? অতনু জিজ্ঞাসা করে।

: প্রতাপগড়ের কুমার বাহাদুর। সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে অ-নে-ক টাকা।

বিলোল কটাক্ষ হেনে নর্তকী জবাব দেয়।

: আমাকে এতক্ষণ বলোনি কেন ?

নর্তকী একটু অপ্রস্তুত হয় সে কথাগুলো বলে : আমাকে যখন কুমার বাহাদুর বকশিশ দেয় তখনই ইসারায় তোমাকে জানাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বিশেষ সুবিধা করতে পারলাম না। তুমি বোধ হয় অন্য চিন্তায় মগ্ন ছিলে।

হেসে অতনু বলে : হ্যাঁ। অন্য চিন্তায় মগ্ন ছিলাম। অন্ন-চিন্তা তো আমার নেই !

বজ্রপানি সিগারেটে আর একটা টান দিয়ে বলে : শুধু অকারণ অর্থচিন্তা। কেমন ?

: কেন ? জানতে চাও, তাই না ?

হো হো করে হেসে ওঠে অতনু। তার সে অট্টহাসি ফাঁকা ঘর-খানায় প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। হাসতে হাসতে বলে : সে তুমি বুঝবে না। জীবনে সৃষ্টির আনন্দ নিয়ে কেউ আত্মহারা। স্থিতির প্রচেষ্টায় কেউ যত্নবান। কিন্তু আমি ?

: তুমি কী ? তাকে নির্বাক দেখে প্রশ্ন করে নর্তকী।

: আমি প্রলয়ের নেশায় পাগল। আমি শুধু ভাঙতে চাই। তাতেই আমার আনন্দ।

নর্তকীর কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে অতনু জিজ্ঞাসা করে : কুমার বাহাদুর কোথায় গেল, সঙ্গে আর কে কে আছে বলতে পারো ?

: সঙ্গে একটা খোসামুদে। আমার নাচ দেখে পেট ভরলো না।

নাক বেঁকিয়ে দুটাকা বকশিশ দিয়ে গ্রেট হোটেলে নাচ দেখতে গেছে। সেই রকমই বলাবলি করছিল ওরা।

কথাগুলো শান্তভাবে শুনে নিয়ে অতনু বলেঃ আচ্ছা। তুমি এখন যেতে পারো।

ঃ আমার বকশিশ? হাত পাতে নর্তকী।

ঃ ফিরে এলে পাবে। সংক্ষিপ্ত জবাব দেয় অতনু।

ঃ গুড্ নাইট। সেলাম জানিয়ে সে রাতের মত নর্তকী বিদায় নেয়।

বয় হুইস্কি নিয়ে আসে। খেতে খেতে অতনু বলেঃ হ্যাঁ, রামলাল, তোমার ফিলম কোম্পানির কাজ এ ক'দিনে কতদূর এগোল?

ঃ কোম্পানি রেজিস্ট্রী হয়ে গেছে। কাজও কিছু এগিয়েছে।

ঃ তুমি তাহলে শেষ পর্যন্ত কোম্পানি করলে?

রামলাল মাথা চুলকে বলেঃ আরে না করে উপায় নেই। এখন পাঁচরকম কারবারে টাকা ছড়িয়ে দিতে হবে। দিন দিন হোটেলের ওপর পুলিসের কিরকম কড়া নজর পড়ছে তা তো দেখতেই পাচ্ছো। কখন কি হয় বলা যায় না। তাছাড়া ইন্‌কাম ট্যাক্সের ব্যাপার তো আছেই।

ঃ তোমার মাথায় কতরকমই যে মতলব খেলে রামলাল! বজ্রপানি নির্বাক হয়ে খাচ্ছিল এতক্ষণ। একটু ভেবে নিয়ে অতনুকে সে বললেঃ আচ্ছা অতনু, তোমার জানাশুনা কোন 'হিরোইন' আছে?

ঃ বহুত খুবসুরত হওয়া চাই। মাথা নেড়ে রামলাল যোগ করলে। অতনু অন্যদিকে তাকিয়ে কিছু ভাবে। তারপর মুখ ফিরিয়ে বলেঃ একটা কথা বলার আছে রামলাল। নতুন ট্যালেন্টেড কোন মেয়েকে আনবার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু তোমরা যা টাকা দেবে তা যেন হয় ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি।

এক চুমুকে রঙীন পানীয়ের সবটা শেষ করে অতনু বলে : আচ্ছা সে কথা পরে হবে।

তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারটা টেনে নিয়ে এলো সে রামলালের খুব কাছে। রামলালের সঙ্গে অতনু গোপনে কয়েকটা কথাবার্তা বলল। তারপর এক টুকরো কাগজে খুব তাড়াতাড়ি কি লিখতে শুরু করল। বজ্রপানি তখন আচ্ছন্নপ্রায়। চুপচাপ বসে সিগারেট টানছে। হোটেলের ওয়েটাররা একে একে বিদায় নিয়েছে। শুধু এক কোণে কাউন্টারে বসে হিসাব দেখছিল ম্যানেজার।

অতনুর সঙ্গে কথা শেষ হবার পর রামলাল ইঙ্গিতে ম্যানেজারকে ডাক দিল। কাছে আসতে তাকে জিজ্ঞাসা করে : আজকের বিক্রি কত ?

: বাজার খারাপ। চারশোর কিছু বেশি হবে।

: পঞ্চাশটা টাকা অতনুবাবুর হাতে দিয়ে দাও।

: আচ্ছা।

প্রস্থানোদ্যোত ম্যানেজারকে ডাক দেয় অতনু।

: একটা বিশ্বাসী লোক দাও তো এখনি ম্যানেজার। কেউ আছে ?

: আছে। বসুন, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ম্যানেজার কাউন্টারে ফিরে গেল। পঞ্চাশটা টাকা আর একটি ওয়েটারকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। সে ওয়েটার হল এ কাহিনীর হতভাগ্য অরূপ।

বাবার চাকরি যাওয়ার দুঃসংবাদ শুনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কাজের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে কোথাও কিছু সংগ্রহ করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত এই হোটেলে সে ওয়েটারের চাকরি নিয়েছে। এখনও সাবালক হয়নি বলে ম্যানেজারের আপত্তি ছিল। কিন্তু রামলাল তার ব্যবহারে মুগ্ধ হওয়ায় আইন না মেনেও তাকে কাজ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য বাইরে ভিড়ের মাঝে পরিবেশনের ভার তাকে দেওয়া হয়নি। অন্দরের কাজকর্ম সে করে।

অরূপ এসে দাঁড়িয়ে থাকে। রামলাল তাকে দেখে বলে : আর সকলে কোথায় ?

: সবাই চলে গেছে। ম্যানেজার জবাব দেয়।

অতনু অতঃপর অরূপকে জিজ্ঞাসা করে : খোকা, তোমার ঘর কোথায় ?

: ঘর আছে। অনেক দূরে। গাড়িভাড়ার পয়সা ছিলনা বলে তিন দিন বাড়ি ফিরতে পারিনি। কাল আর আজ কিছু বকশিশ পেয়েছি। আজ যাব।

অতনু একবার অরূপের আপাদমস্তক দেখে নেয়। অরূপের একটু ভয় ভয় করে অতনুকে দেখে। অতনু বলে : আগে একটা কাজ করোত খোকা। বাইরে হোটেলের দরজার কাছে যে কানা ভিখিরিটা বসে আছে তার কাছে গিয়ে বলবে 'ব্লাইণ্ড'। তারপর তার হাতে এই চিঠিখানা দেবে। বুঝলে ?

চিঠিখানা হাতে নেয় অরূপ। এসব রহস্য তার অজানা। কে কানা ভিখিরি ? কি তার কাজ ? কেনই বা তাকে চিঠি দেবে, সে সব সত্যিই হেঁয়ালি।

তবুও আদেশ পালন করতে তৎপর হয় সে।

: আচ্ছা। আদেশ পালন করতে চলে যাচ্ছিল অরূপ। অতনু তাকে আবার ডাক দিল।

: আর শোন। এই নাও।

একখানা পাঁচটাকার নোট অরূপের পকেটে দিয়ে দেয় অতনু। একটু অপ্রস্তুত হয়ে অরূপ বলে : আমার কাছে তো ভাঙানি নেই।

: ভাঙানির দরকার নেই। সবটাই দিলাম। গরীবদের আমরা সাহায্য করে থাকি। কাজ সেরে তুমি বাড়ি যাও।

খেয়ালে অরূপের পিঠটা চাপড়ে দেয় অতনু।

অরূপ ভাবতে ভাবতে বিদায় নেয়।

বজ্রপানি আপন মনেই বলে ঃ ছেলেটাকে ভাল বংশের বলেই মনে হচ্ছে। ছেলেটির নাম কি ?

ম্যানেজার বলে ঃ অরূপ। শুনছিলাম বাপ মা আছে। বাপের চাকরি গেছে, তাই পেটের দায়ে ওই ছেলেকে রোজগারের ধান্দায় বেরোতে হয়েছে।

সে কথা শুনে বজ্রপানির মনে একটু সহানুভূতি জেগে ওঠে। বলে ঃ আচ্ছা, ওর মাইনে থেকে কিছু আগাম দিয়ে দেওয়া যায় না ?

রামলাল সে কথা সমর্থন করে। ম্যানেজারকে বলে ঃ মাসের আধা মাইনে কাল ওকে দিয়ে দাও। ছেলেটাকে বিশ্বাসী বলেই মনে হয়।

সেকথা শুনে মাথাটা তুলে একবার রামলালের দিকে তাকিয়ে অতনু বলতে থাকে ঃ যতই বিশ্বাসী বলে মনে হোক, একটু চোখ রেখো ম্যানেজার।

ঃ আচ্ছা।

ম্যানেজার নিজের কাজে চলে যায়। অতনু উঠে দাঁড়িয়ে চিন্তিতভাবে পায়চারি করতে থাকে। ঘুরে দাঁড়িয়ে রামলালকে বলে ঃ রামলাল, তোমার গাড়ি আর লোকজন তৈরী ?

ঃ কেনারাম নাম্বার-প্লেট রেডি করে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে এতক্ষণে।

রামলালের জবাব শুনে অতনু কাছে এগিয়ে আসে। হাত বাড়িয়ে বলে ঃ আমার 'টয়' ?

ঃ এনেছি। পিছনে দাঁড়িয়ে ম্যানেজার। অতনুর হাতে সে তুলে দেয় একটা পিস্তল। সবাইকে গুড্ নাইট জানিয়ে হোটেলের পিছনের দরজা দিয়ে দ্রুত বিদায় নেয় অতনু।

রামলাল চোখ বুজে কপালে যুক্ত হাত ঠেকিয়ে বলে ঃ জয় রাধাকিষণ ! জয় রাধাকিষণ !!

॥ তিন ॥

পরের দিন সকাল। অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য পুলিস স্টেশনে। থানার অফিসার-ইন-চার্জ রজত সান্যাল মনযোগ দিয়ে ফাইল দেখছিলেন। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় ভরা তাঁর মুখখানা। কোমলতার লেশমাত্র নেই। কাঠিন্যে মুখের রঙ তামাটে হয়ে গেছে। কানের ওপরে দুপাশের চুলে পাক ধরেছে। চাকরি-জীবনে দীর্ঘদিন চোর জুয়োচোর, খুনী, বদমাইস বহু দেখেছেন তিনি। শিখেছেনও বহু। মাথা খাটিয়ে অনেক রহস্যজনক অপরাধের কিনারা করেছেন। জীবনটাই হয়ে গেছে যান্ত্রিক।

গত রাত্রে ম্যাণ্ডেভিলা গার্ডেন্‌স্‌-এ একটা দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়ে গেছে। তারই অনুসন্ধানে ব্যস্ত রজত সান্যাল। আধপোড়া সিগারেটের টুকরোটা অন্যমনস্কভাবে অ্যাশট্রেতে রেখে ফাইল থেকে মুখ তুলে ডাক দিলেন ঃ দরজা, এ দরজা।

ঃ সেলাম সাহাব। পালোয়ানের মত চেহারা হীরা সিং সামনে এসে দাঁড়ায়।

ঃ সাব ইনস্‌পেক্টর সাহাব কো বোলাও।

হীরা সিং প্রস্থান করে। দুটো জুতোয় শব্দ করে আর একটা সেলাম দিলে। তরুণ সাব ইনস্‌পেক্টর বিমান ঘরে ঢুকে বলে ঃ আমাকে ডাকছিলেন স্যার?

ঃ হ্যাঁ। বোসো।

ফাইলটা আরও কিছু দেখে রজত শুরু করেন ঃ কাল রাত্রে ম্যাণ্ডে-

ভিলা গার্ডেন্স্‌-এ কুমার বাহাদুর যে অতর্কিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন তাঁর অবস্থা এখন কেমন ?

: গুরুতর কিছু আঘাত লাগেনি। এইমাত্র খবর পেলাম তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে আজ সকালেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে, তাঁর সঙ্গে যে লোকটি ছিল তার বাঁ হাতে বুলেট লেগেছে।

: বুলেট বিঁধেছে ?

আঁজ্ঞে না।

বুলেটটা পথে কোথাও পাওয়া গেছে কি ?

: না স্যার। স্পট এনকোয়ারিতে অনেক খুঁজেও সেটা পাইনি।

: অপদার্থ। কাল আমাকে তালতলা মার্ডার কেসটা সম্বন্ধে পারসোনালি যেতে হয়েছিল আর তার মধ্যেই ঘটে গেল এতবড় একটা কাণ্ড !

নিজের অযোগ্যতার কথা ভেবে একটু বিব্রত বোধ করে বিমান কোন রকমে সাহস সঞ্চয় করে বলে : আঁজ্ঞে আর্থিক ক্ষতি বেশ কিছু হয়েছে মানছি। কিন্তু হেডকোয়ার্টারের একখানা মোবাইল ভ্যান এসে পড়ায় ডাকাতরা তীরবেগে পালিয়েছে। প্রাণ যায়নি কারও।

: পালানোটাই তো আশ্চর্য। মোবাইল ভ্যান এসে পড়া সত্ত্বেও তাদের ধরা গেল না।

আর একটা সিগারেট ধরিয়ে রজত ওপর দিকে চেয়ে ভাবতে থাকেন। বিমান শুরু করে : গাড়িখানা স্যার পরিত্যক্ত অবস্থায় লেকের ধারে পাওয়া গেছে।

রিপোর্ট লিখতে লিখতে রজত জিজ্ঞাসা করেন : গাড়ির নাম্বার দেখে মালিকের খোঁজ করা হয়েছে ?

: আঁজ্ঞে হয়েছে স্যার। নাম্বারের শেষের 'এক'টাকে 'চার' করা হয়েছে রঙ দিয়ে। আসল যা নাম্বার, সে গাড়ির মালিক একজন পাঞ্জাবী

রেলওয়ে কনট্রাক্টর। দু সপ্তাহ আগে গ্যারেজ ভেঙে তাঁর গাড়িখানা চুরি যায়। এই মর্মে বেলতলা থানায় তিনি ডাইরি করে রেখেছেন।

ঃ আচ্ছা।

একটু ভেবে নিয়ে রজত সান্যাল আবার বললেন ঃ যাই হোক, সেই পাঞ্জাবী মালিককে নজরবন্দী করে রাখবে। আর, তার চরিত্র সম্বন্ধে অত্যন্ত গোপনে একটা স্থানীয় তদন্তের ব্যবস্থা করবে। আর হ্যাঁ, রামলাল গোয়েঙ্কা সম্বন্ধে যে তথ্য সংগ্রহ করতে বলেছিলাম তার কি হলো ?

মাথা চুলকে বিমান বললে ঃ রামলালকে সন্দেহ করে আমাদের মিথ্যে হায়রানি হল স্যার। সে একজন বড় ব্যবসায়ী ধর্মভীরু লোক। তাছাড়া তার নিজের এলাকায় দানশীল বলে তার বেশ খ্যাতিও আছে।

ঃ যদি মান রাখবার জন্যে দানের প্রয়োজন হয় ?

ফাইল থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকান রজত সান্যাল।

ইতস্তত করে বিমান বলে ঃ সে কথা আলাদা স্যার। কিন্তু ওই তেলকধারী দানশীল লোকটির ভেতরটা কি এতটা নোঙরা হবে ?

ম্লান হাসি ফুটে ওঠে রজতের মুখে। ফাইল থেকে চোখ তুলে বিমানের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেন ঃ কত বছর হলো তোমার এই লাইনে ?

ঃ আজ্ঞে পাঁচ বছর।

ঃ পঁচিশ বছর না হলে এসব ভাববার বুদ্ধি মাথায় আসবেনা। আজকের দিনে পুলিসের সুনজরের এতই প্রখরতা যে ছদ্মবেশ না হলে চুরি ডাকাতি জালিয়াতি কোন কিছুরই বিশেষ সুবিধা হয় না। বোকা সেজে থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ আর—

একটু থেমে গলাটাকে অনেক নামিয়ে বললেন ঃ ভালমানুষিই হচ্ছে ধূর্ততার আবরণ। তাই সহজে আমি আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারিনা।

একথায় বিমানের মন পুরোপুরি সায় দেয় না। ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে বলে সে ঃ কিন্তু বিরুদ্ধে কোনো রিপোর্ট না পেলেও—

ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে শুরু করেন রজত : বিরুদ্ধে রিপোর্ট না পেলেও সন্দেহ করে নজরবন্দী রেখে পুলিস পরে দেখেছে তার সন্দেহ অমূলক নয়। আমার জীবনে আমি দেখেছি নিঃস্ব সাধু, ছদ্মবেশী। সাত-সাতটা ডাকাতির সঙ্গে জড়িত। ওপর থেকে দেখতে গরীব ব্রাহ্মণ —জালিয়াতি যার পেশা। অমায়িক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক—একহাজার পকেটমারের সর্দার।

আশ্চর্য হয়ে বিমান শুনতে থাকে অফিসারের অভিজ্ঞতার কথা। একটা সিগারেট ধরিয়ে রজত আবার বলেন : সেইজন্যেই বলছি যে একটু চোখ রেখে চলাই ভাল। সোনা দেখতে খাঁটি হলেও তার মধ্যে যে খাদ থাকবে না এ কথা জোর করে বলা যায় না।

বিমান অফিসারের উপদেশগুলো শিরোধার্য করে বিনীতভাবে বললে : আপনার নির্দেশমতই তাহলে কাজ করব।

সিগারেটে একটা জোর টান দিয়ে রজত বললেন : হ্যাঁ। তাই কোরো। আর হ্যাঁ, কালকের ডাকাতি সম্পর্কে এ পর্যন্ত ক'জনকে ধরা হয়েছে ?

: তিনজনকে। তাদের কাছ থেকে কোন তথ্যই পাওয়া যায়নি।

: আচ্ছা। বিকেলে একবার আমার কাছে তাদের নিয়ে এসো। আর হ্যাঁ, কোন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পাওয়া গেছে কি ?

: আজ্ঞে না স্যার। জায়গাটা এতই নির্জন যে ঘটনার সময়ে কোন লোকই নাকি কাছাকাছি ছিল না।

: আচ্ছা। তুমি এখন যেতে পারো। বিকেলে ওদের নিয়ে এসো। ওদের নিয়ে আমি যাব কুমার বাহাদুরের কাছে। দেখি তিনি কাউকে সনাক্ত করতে পারেন কিনা।

বিমান উঠে চলে যায়। নির্জন ঘরখানায় চেয়ারে বসে দুলতে দুলতে সিগারেটের ধোঁয়ায় রিং করতে থাকেন রজত সান্যাল। ভাবতে থাকেন কোন্ পথে এগোলে এ অপরাধের কিনারা করা যাবে।

বর্ষার রাত। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে। হোটেলে কাজ সেরে অরূপ বাড়ি ফিরেছে কিছু আগে। গতরাত্রে অতনুর কাছে পাওয়া টাকা আর বকশিশ একত্র করে বাবার জন্যে এনেছে ওষুধ আর ফলমূল। চাকরি চলে যাওয়াব চিন্তাটা ভীষণ একটা প্রতিক্রিয়া এনেছে হরিনারায়ণের মনে। তার ওপব অরূপের উপার্জনেব পয়সায় নিজের গলা দিয়ে ওষুধ নামতে চায় না। বিছানায় শুয়ে ক্রমেই বিচলিত হয়ে পড়েন হরিনারায়ণ। করুণা তাঁকে সান্ত্বনা দেন। কিন্তু কোন সান্ত্বনাই আজ আর ভোলাতে পারেনা তাঁকে। হরিনারায়ণ বলেন: আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না গিন্নী। একরত্তি ছেলে। ওর এখন হেসে খেলে বেড়াবার সময়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ও রোজগার করে আনবে টাকা? এ দৃশ্য দেখার আগে আমার মৃত্যু হল না কেন?

সে কথা শুনে করুণারও চোখে জল আসে। কিন্তু এই সঙ্কট মুহূর্তে উপায়ই বা কী? কোনরকমে অশ্রু সংবরণ করে করুণা বলেন: ওকে দেখে কষ্ট কি আমারও হচ্ছে না? আমারই কি প্রাণ থাকতে ইচ্ছে করে ওর রোজগারের পয়সায় মুখে ভাত তুলি? আর, তাছাড়া তোমাকে তো ভাল করে তুলতে হবে।

: আমাকে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টার মধ্যে শুধু অর্থব্যয়, শুধু সময় নষ্ট। নিজের মনকে সান্ত্বনা দেবার শুধু ব্যর্থ আশা। সে চেষ্টার কী প্রয়োজন আছে বলতে পারো?

করুণা তবুও আশার ভাষা শোনান।

ঃ তুমি নিজে অমন করে নিরাশ হয়ো না। তুমি এমন নিরাশ হলে আমরা কিসের জোরে দাঁড়াব বলো ?

হরিনারায়ণ আস্তে আস্তে বিছানায় উঠে বসেন। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন ঃ কিসের জোরে দাঁড়াবে ? শিরদাঁড়া তোমাদের ভেঙে দিয়েছি। অনাদরে অবহেলায় তোমাদের দেহে আর কত শক্তি আছে ? লজ্জা ঢাকবার জন্যে প্রয়োজন মতো কাপড় দিতে পারিনি। দুবেলা পেট ভরে বোধ হয় খেতেও দিতে পারিনি। তবু তোমরা আমার দিকে চেয়ে বসে আছ আশার আলো হাতে নিয়ে।

স্বামীর হাত চেপে ধরে করুণা অনুযোগ জানান ঃ ওগো তুমি এমন করে বোলো না।

হরিনারায়ণের চোখ ছলছল করে। মুখের ভাষা বুঝি ফুটে ওঠে চোখে।

ঃ দুঃখ হয় তোমাদের দেখে। কী নীরব সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি তোমরা। সংসারকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে সারা জীবন খেটে বিনিময়ে তার কিছুই পাওনি। কিন্তু তাতে একদিনের জন্যেও বিরক্তির কোনো আভাস দেখতে পাইনি তোমার মুখে।

ঃ স্বামীর সেবা করাই যে মেয়েদের ইহকাল পরকালের ধর্ম। জন্ম-জন্মান্তরের শিক্ষা যে সেই পথেই আমাদের নিয়ে যায়।

চুপ করে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকেন হরিনারায়ণ। রাতও অনেক হয়েছে। পাশের ঘরে অনুরূপা ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম নেই শুধু হরিনারায়ণ আর করুণার চোখে। একজনের বাঁচবার চিন্তা। আর একজনের বাঁচাবার চিন্তা। করুণার হাত দুটি ধরে হরিনারায়ণ বলেন ঃ করুণা, তুমি পরজন্ম মানো ?

ঃ মানি।

: তাহলে তোমাকে আশীর্বাদ করছি পরজন্ম যেন এমন কাঙালের হাতে তোমাকে না পড়তে হয়।

মাথা নেড়ে করুণা বলেন : না না, ওকথা বোলো না। বরং আশীর্বাদ কর পরজন্মে যেন তোমারই সঙ্গে মিলতে পারি।

এবারে আর অশ্রু ধরে রাখতে পারেন না হরিনারায়ণ। ছুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে চোখ দিয়ে। সে অশ্রু বেদনার, আশার, আনন্দের, ভালবাসার। প্রায় স্বগতোক্তির মতো বলতে থাকেন : আমি শুধু ভাবি, এতখানি ত্যাগের ব্রত যার জীবনে সে কেন হল এত ছুঃখী।

অপূর্ব একটা আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে করুণার মুখখানা।

: ত্যাগের ব্রত যার জীবনে, সে কোনকালেই ছুঃখী নয় গো। ত্যাগেই তার সুখ।

অন্ধকারেও করুণা দেখতে পান স্বামীর মুখে ম্লান হাসির একটু আভাস।

হরিনারায়ণ জিজ্ঞাসা করেন : অনু কি ঘুমিয়ে পড়েছে ?

: হ্যাঁ। অনেকক্ষণ। ওর শরীরটা আজ বিশেষ ভাল নেই।

একটু চুপ করে থেকে করুণা আবার বলেন : জানো, মেয়েটার জন্যেই আমার যত ভাবনা। ওর দিকে তাকালে আমার বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে ওঠে। ভগবান ওকে অমন রূপ দিলেন কেন ?

: দেখবে গিন্নী, ও একদিন ওই রূপের জন্যেই রাজার ঘরণী হবে। রূপোর অভাব ওর ভাগ্যকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। ছেলেবেলায় এক জ্যোতিষী বলেছিল বড় হয়ে ও অনেক ঐশ্বর্য পাবে।

করুণার হাসি পায় সে কথা শুনে। বলে : ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখটাকার স্বপ্ন তুমি দেখতে পারো কিন্তু তা শুনে আমি আশ্বস্ত হব না। আর, রাজার ঘরণী হওয়ার আকাশ-কুসুম কল্পনাও আমি করি না।

আবার শুয়ে পড়েন হরিনারায়ণ। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করেন। বলেন : একটা অনুরোধ রাখবে গিন্নী ?

: রাখব। বলো।

: আমাকে একটা বিড়ি দেবে?

: বিড়ি? না না। কাশি আসবে আবার। নেশা করা তোমার বারণ।

সে কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন হরিনারায়ণ।

: কাশি আসে আসুক। ডাক্তার তো বলেছে সব খেতে পারি। তুমি দাও।

অগত্যা উঠে যেতে হয় করুণাকে। সারা ঘরখানার এদিক সেদিক ঘুরে দেখে টেবিলের ড্রয়ার ও জামার পকেট খুঁজে কোথাও বিড়ি পেলেন না। ফিরে এসে বলেন: তোমার মেয়ে কি কিছু রেখেছে? বিড়ি দেখলেই জানলা গলিয়ে ফেলে দেয়।

: তাহলে? অসহিষ্ণু হরিনারায়ণ বলেন।

: অরূপ জেগে আছে কিনা দেখি। করুণা জবাব দেন।

এই কথা বলে করুণা উঠে যান। এ ঘরখানা বাইরের দিকে। এ ঘর পেরিয়ে ভেতরদিকে একখানা ঘর আছে। সেটা ভাঁড়ার আর ঠাকুরঘর একত্রে। সেই ঘরেই থাকে অনুরূপা আর অরূপ। করুণা গিয়ে দেখেন অনুরূপা অকাতরে ঘুমোচ্ছে। অরূপ জেগে বই পড়ছে। একখানি ইংরাজি অ্যাডভেঞ্চার বইয়ের অনুবাদ। অরূপকে পয়সা দিয়ে বিড়ি কিনতে পাঠালেন তিনি। ঘড়িতে তখন ঢং ঢং করে বারোটা বাজল।

বর্ষার রাতে বিশ্বনাথ মতিলাল লেনের চেহারাটা মৃত সরীসৃপের মতো। রাস্তায় তখন জনপ্রাণী নেই। একটা মাতাল থিয়েটারের ভঙ্গিতে 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' বলতে বলতে বিপরীত দিক

থেকে আসে। অরূপের ভয় করে। পাশ কাটিয়ে দাঁড়ায় সে। মাতালটা চলে যাবার পর সে এগোতে থাকে হিদারাম ব্যানার্জি লেনের দিকে। কারণ, কাছাকাছি পানবিড়ির দু'একটা যা দোকান ছিল তা তখন বন্ধ হয়ে গেছে। গা ছমছম করে তার। এত রাতে রাস্তায় কখনও বেরোয় নি। দু'একপা এগোতেই দেখে অল্প পিছু হেঁটে গ্যাস-পোস্টের পিছনে গিয়ে দাঁড়ায় একটি লোক। পরনে তার সার্ট ও প্যান্ট। মাথায় ফেল্টের টুপির মতো পাতলা একটা টুপিকপালের দিকে নামানো। সে দৃশ্য দেখে ভয়ে শিহরিত হয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে পড়ে অরূপ। হাত পা তার ক্রমশঃ শিথিল হয়ে যায়।

ঃ কে? আরে, অরূপ না? অস্ফুটকণ্ঠে সেই লোকটি জিজ্ঞাসা করে।

ঃ আপনি?

এই পর্যন্ত বলেই থেমে যায় অরূপ। অপরিচিত লোকের কাছে এই রহস্যজনক অবস্থায় গভীব রাত্রে নিজের নাম শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায় সে। ছায়ামূর্তির মতো লোকটি দুপা কাছে এসে বলেঃ 'ব্লাইণ্ড'। চিনতে পারো? আমি অতনুবাবু।

এই রাত্রে এই অবস্থায় অতনুকে দেখে আশ্চর্য হয়ে যায় অরূপ।

ঃ অতনুবাবু! আপনি এতরাত্রে এখানে? আজ তো আপনাকে হোটেলে দেখিনি।

ঃ সে সব কথা পরে হবে। আপাতত এইটুকু জেনে রাখো পুলিস আমার পেছু নিয়েছে। এই মুহূর্তে কোনো একটা আশ্রয় না পেলে ভয়ানক বিপদ হবে।

অবাক হয়ে অরূপ জিজ্ঞাসা করেঃ বিপদ হবে? কেন?

ঃ সে সব তুমি বুঝবেনা। আমরা রাজনীতি করি কিনা, তাই। কিন্তু বেশি কথা বলবার তো আমার সময় নেই। তোমার বাড়ি কোথায়?

ঃ কাছেই।

ঃ আজকের রাতটুকুর মতো কি আশ্রয় পাবনা তোমাদের বাড়ি?

অসহিষ্ণুর মতো প্রশ্ন করে অতনু।

অরূপ একটু সহানুভূতি নিয়ে বলে ঃ আচ্ছা, দাঁড়ান। আমি বাবার বিড়ি কিনতে বেরিয়েছি। কিনে এনে আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

অধৈর্য অতনু চুপি চুপি বলে ঃ সেটুকু অপেক্ষা করাও চলবেনা অরূপ। আমার কাছে সিগারেটের টিন আছে। বিড়ির বদলে সিগারেট পেলে তোমার বাবা নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না।

ঃ তবে চলুন।

ঃ চলো।

পা টিপে টিপে অরূপকে অনুসরণ করে অতনু। সরকারী রোষের কোপানলে বিব্রত এক দেশকর্মীকে আশ্রয় দিতে পারায় অরূপের কিশোর মনটা আনন্দে ভরে যায়। অবোধ বালক জানতে পারেনা এই আত্মগোপনের নেপথ্য ইতিহাস।

ম্যাণ্ডেভিলা গার্ডেন্‌স-এ কুমার বাহাদুরের আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে অতনু পলাতক। পুলিসের নজর পড়েছে রামলাল গোয়েঙ্কার ওপর। যে কোন মুহূর্তে অতনু বা তার দল ধরা পড়তে পারে। পকেটে এখনও লুণ্ঠনের টাকার একটা মস্ত বড় অঙ্ক। তার ওপর পুলিসের তল্লাস। জীবনমরণের এই সন্ধিক্ষণে অরূপের কাছে পাওয়া আশ্রয় পরম নিশ্চিন্ততায় ভরে দিল অতনুর মনটা। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে অরূপ তার সঙ্গে মা বাবার পরিচয় করিয়ে দিল। বিপন্নকে আশ্রয় দিতে পেরে করুণা খুশি হয়েছিলেন। দামী সিগারেট পেয়ে হরিনারায়ণ খুশি হয়েছিলেন। অতিথির যথাযোগ্য আপ্যায়নের ত্রুটি হল না। হরিনারায়ণের ঘরে অতনুর শোওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন করুণা।

সে রাতে লক্ষ চিন্তা মাথায় নিয়ে রিক্ত জীবনের এক বেদনাভরা পরিবেশে অতনুর চোখে ঘুম এসেছিল কি না জানিনা। তবে, নিশ্চিন্ত

আশ্রয়ের পরম নির্ভরতায় অনেকখানি কৃতজ্ঞতা তার মনে জমে উঠেছিল চুনবালিঝরা সেই জীর্ণ বাড়িটায় ঢুকে করুণার কাছে আশ্রয় লাভের অনুমতি পেয়ে। অনেকদিন পরে পায়ে হাত দিয়ে সে প্রণাম করেছিল। প্রণাম করেছিল করুণাকে।

॥ পাঁচ ॥

ভোর হওয়ার আগেই ঘুম থেকে উঠেছিল অনুরূপা। ঘুম থেকে জেগে মায়ের কাছে শুনেছে রাতের আঁধারে এক অতিথি আশ্রয় নিয়েছে তাদের সংসারে। কোন্ বিপাকে পড়ে কেমন করে আশ্রয় ভিক্ষা করেছিল ভদ্রলোক সব কথাই শুনেছে সে।

চায়ের আয়োজন করতে অনুরূপা তখন রান্নাঘরে ব্যস্ত। কলতলা থেকে করুণা এসে ভিজে কাপড়ে রান্নাঘরে দাঁড়ান।

ঃ হ্যাঁরে, চা হয়ে গেছে ?

ঃ না মা। দেরি আছে একটু।

ঃ আমি তাহলে পূজোয় বসি। চা তৈরি হলে ভদ্রলোককে এক কাপ দিয়ে আসিস। আমি তোর বাবার ঘরে বসে একটু জপ তপ সেরে নিই।

অনুরূপা একটু বিরক্ত হয় করুণার কথায়। সে বিরক্তি ফোটে তার মুখে। বলে ঃ কোথাকার কে ভদ্রলোক! তাকে আবার চা খাওয়াতে হবে!

আহত হয়ে করুণা বলেন ঃ আহা। ওকথা বলতে নেই। অতিথি নারায়ণ। ও তো ঘুম থেকে উঠেই চলে যাচ্ছিল। আমিই শুধুমুখে যেতে দিলাম না।

ঃ আচ্ছা ঠিক আছে। চা হলে দিয়ে আসব'খন।

করুণা চলে যান। অনুরূপা কি ভাবতে ভাবতে চা তৈরি করে। তারপর দুখানা বিস্কুট আর এক পেয়ালা চা নিয়ে যায়।
ঘরে ঢুকে চায়ের পেয়ালাটা হাতে তার কেঁপে ওঠে। দুরন্ত বিস্ময় ফুটে ওঠে তার চোখে। বাকশক্তি হারিয়ে যায় অনুরূপার। আর, তার দিকে চেয়েও অবাক চোখে অতনু বলে ওঠেঃ একি! অনুরূপা তুমি! বিস্ময়ের ঘোরটা কাটিয়ে অনুরূপা বলেঃ অবাক হচ্ছেন নাকি?
ঃ অরূপ তাহলে তোমার—
ঃ ভাই। কথাটা শেষ করে অনুরূপা।
সহজ হবার চেষ্টা করে অতনু বলেঃ অবাক একটু হচ্ছি বৈকি। কলেজের মেধাবিনী ছাত্রী। নাচে গানে পারদর্শিনী···
ঃ তার আজ এই রূপ। তাই না?
দাঁতগুলো পাতলা ঠোঁটে চেপে অনুরূপা বলে।
অতনুর মুখে আর কোন কথা সরে না। অনুরূপা এগিয়ে এসে চায়ের পেয়ালাটা রাখে অতনুর কাছে। অদূরে একটা হাতল ভাঙা চেয়ারে বসে বলতে থাকে সেঃ দারিদ্র্যের কশাঘাতে প্রতিভার হয় অকাল মৃত্যু। মন থেকে নাচ গান সমস্ত শখের হয় নির্বাসন।
ঃ আমি যে নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছি না অনুরূপা।
শাড়ির আঁচলটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে অনুরূপা বলেঃ ওই এক কথা তো আমিও বলতে পারি অতনুবাবু। তিনবছর আগে পটলডাঙায় থাকতে আপনাকে যা দেখেছিলাম আজকের আপনার সঙ্গে তার অনেক তফাত। আলোছায়া ক্লাবের অতনু মল্লিক আজকের পলাতক অতনু মল্লিক হয়েছে এও যে আমি চিন্তা করতে পারছিনা।
অনুরূপার এই কথায় অতনু নিজেকে একটু বিব্রত বোধ করে। অনুরূপার চোখে সে খুঁজতে থাকে সন্দেহের ছায়া। নাটকীয়ভাবে ধীরে ধীরে স্বপক্ষে বলেঃ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের জীবনের ধারা বদলে যায়। বদলে যায় তার আদর্শ আর কর্মপন্থা। একথা তুমি মানো?

ঃ মানি বলেই তো আর টানিনা পেছনে ফেলে আসা দিনগুলো। ধীর ভাবেই জবাব দেয় অনুরূপা। কথার মাঝে চায়ের কথাটা ভুলেই গিয়েছিল অতনু।

ঃ চা-টা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। মনে করিয়ে দেয় অনুরূপা।

ঃ খাচ্ছি। চায়ে চুমুক দেয় অতনু।

অনুরূপার মনে কলেজ জীবনের অনেক স্মৃতি ভেসে ওঠে। কী সুন্দর, কী মধুর ছিল সেই দিনগুলো। মনে পড়ে জয়াকে। তারই মারফত আলাপ হয়েছিলো অতনুর সঙ্গে। বন্যাবিধ্বস্তদের সাহায্য করবার জন্যে অতনুর ক্লাবে একটা অভিনয় হয়েছিল। তাতে অংশ গ্রহণ করে প্রচুর প্রশংসা পেয়েছিল অনুরূপা। সেই সব দিনের কথা ভেবে জিজ্ঞাসা করেঃ আমাদের জয়ার কি খবর অতনুবাবু?

সহজভাবে জবাব দেয় অতনুঃ শুনেছি কোন এক জমিদারের ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে।

একথা শুনে খুশী হয় অনুরূপা।

ঃ আজ জয়ার কথা খুব মনে পড়ছে আপনাকে দেখে।

ঃ হ্যাঁ, জয়াই তো আবিষ্কার করেছিল তোমার ভেতরকার অভিনয়-ক্ষমতা। আজকাল কি সব ছেড়ে দিয়েছ নাকি?

ঃ পাকাপাকিভাবে কোনদিন তো ধরিনি। সেবার একটা মহৎ কাজে অভিনয় করেছিলাম। সেই আমার প্রথম আর সেই আমার শেষ।

চা খেতে খেতে অতনু বলেঃ কিন্তু তোমার অনন্যসাধারণ অভিনয়-ক্ষমতা—

তাকে থামিয়ে অনুরূপা বলেঃ সাধারণের কাছে দেখিয়ে না-ই বা বাহবা পেলাম। সংসার রঙ্গমঞ্চে সারাজীবন তো অভিনয় করতেই হবে।

অনুরূপার এই বিচক্ষণতা খুব ভাল লাগে অতনুর। হয়ত একটু

দুঃখও হয় তার। বলে ঃ তোমার জীবনটা সত্যিই একটা ট্র্যাজেডি।
ঃ জীবন ট্র্যাজেডিই হয় অতনুবাবু। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অনুরূপা।
হার না মেনে অতনু বলে ঃ কিন্তু সবকিছু থাকা সত্ত্বেও—
ঃ কিছু হল না। কেমন? জিজ্ঞাসু চোখে অনুরূপা চেয়ে থাকে অতনুর দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বলে ঃ ভাগ্যের পরিহাসকে ঠেকিয়ে রাখবার হাত মানুষের নেই অতনুবাবু। অঙ্কুরেই নষ্ট হয় কত ফুল, ফোটার আগে ঝরেও যায় কত। দেবতার চরণে স্থান পাবার সৌভাগ্য সকলের হয় না। পবিত্রতা তাদের কম নয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হবার ভাগ্য নিয়ে তারা জন্মায়নি।
অতনু বলে ঃ কিন্তু তোমার মতো মেয়ের জীবন দারিদ্র্যের পীড়নে নষ্ট হয়ে যাবে এ যে ভাবা যায় না।
ঃ যা ভাবা যায় না বাস্তবে তাই ঘটে। আমি যখন সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রী বাবা পড়লেন অসুখে। সেই থেকে আজও শয্যাশায়ী। পটলডাঙার ফ্ল্যাটটা ছেড়ে উঠে এলাম এই এঁদো গলিতে। বাবার পুরো মাইনে থেকে হল আধা। আমার পড়াশুনাও হল বন্ধ। বাবার শরীরে সুস্থতার কোন লক্ষণ আজও দেখা গেল না। ফলে চাকরিটা গেছে। আজ সবার মুখে ভাত তুলে দেবার ভার পড়েছে একটা বালকের হাতে।
অতনু নির্বাক বিস্ময়ে ভাবতে থাকে অনুরূপার কথাগুলো। এক দৈবদুর্বিপাকে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হয়েছে দুজনের। কিন্তু তিনটি বছরের মধ্যে কী দুস্তর ব্যবধান রচিত হয়েছে দুজনেরই মাঝে। কী ভীষণ ওলোট পালোট হয়ে গেছে দুটি জীবন। একজন দুহাত ভরে ঐশ্বর্য পেয়ে খেয়ালে খামখেয়ালে নেশায় ভোগে দিনের পর দিন তা নিঃশেষ করেছে। আর একজন পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সংসার থেকে চপলা লক্ষ্মী এক পা এক পা করে সরে গেছেন চোখের আড়ালে।

অতনু ভাবে অনুরূপা খুব ভেঙে পড়েছে। তাকে সাহস দেবার জন্যে অতনু বলে : দারিদ্র্যের কাছে হার স্বীকার করে তোমার মাথা কোনদিন যেন নিচু না হয়।
উপদেশ অনেকের কাছে অনেক শুনেছে অনুরূপা। তার পুনরাবৃত্তি অতনুর মুখে আর ভাল লাগে না। হাসি পায় তার। অদ্ভুত একটা হাসি ফোটে তার মুখে। হাসতে হাসতে বলে : অপটিমিসম্ আমার নেই। তবে, সময়ের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে চলার ধৈর্য আর স্থৈর্য আমার সংস্কার বলতে পারেন। তাই, সুখেও আমি কোনদিন আত্মহারা হইনি দুঃখেও বিচলিত হইনি কোনদিন।
: তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না অনু।
চায়ের পেয়ালাটা শেষ করে একটা সিগারেট ধরায় অতনু।

একটু সংযত হয়ে আবেগকে দূরে ঠেলে অনুরূপা বলে : আমিও বোঝাবার চেষ্টা করছি না। বিপদে পড়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত জেনে একটা রাত আমাদের এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। দেয় কৃতজ্ঞতার গণ্ডী পেরিয়ে আমাদের বিপদে নাই বা বিচলিত হলেন।
অতনুকে চুপ করে থাকতে দেখে একটু হেসে অনুরূপা আবার বলে : মার কাছে শুনছিলাম দেশের কাজ করতে নেমেছেন। দশের দুঃখ এত তাড়াতাড়ি বুঝলে দেশনেতা হওয়া যায়না। বুঝলেন?
সহজে আর কোন কথা বলতে পারেনি অতনু। অনুরূপার কথাগুলো তীব্র বিদ্রূপের জ্বালা ছড়িয়ে দিয়েছে তার সারা দেহে। স্নায়ুর তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে এক গভীর আঘাত হেনেছিল তার প্রতিটি কথা। একবার ভেবেছিল আর কোন কথা বলবেনা। ভাঙা বাড়িটা থেকে বেরিয়ে সত্যিই তো ভুলে যাবে সে সব। দিনের আলো নিভে গিয়ে আঁধার যখন ছেয়ে যাবে, তখন তো সে অন্য মানুষ। তখন মৃত্যুর সামনে দাঁড়াতে সে কাঁপবে না। রক্ত দেখে তার উল্লাস যাবে বেড়ে।

তবে কেন এই দুর্বলতা? এত কথা না বলে এক রাত্রের আশ্রয়ের জন্যে একটা গরীব সংসারকে কিছু অর্থ সাহায্য করে চলে গেলেই ভাল হতো। কয়েক মিনিট চুপ করে ভাবে অতনু।

তারপর জিজ্ঞাসা করে : তোমার মা কোথায় অনু?

: কেন? আপনি যাবেন? মা এখন পূজোয় বসেছেন। উঠতে দেরি হবে। দুঃখ থেকে রেহাই পাবার জন্যে দুঃখহরণকে একটু বেশিক্ষণই ডাকেন।

অতনু বিচলিত হয়ে বলে : আমি তাহলে এখন উঠি অনু।

উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে একশো টাকার একটা নোট বার করে হাত বাড়িয়ে অতনু বলে : যদি কিছু মনে না কর এই টাকাটা রেখে দাও।

এ কথায় অনুরূপার আত্মসম্মানে নিদারুণ আঘাত লাগে। মুহূর্তে কঠিন হয়ে যায় সে। কঠোর ভাবে বলে : ওটা আপনার পকেটেই রেখে দিন। জেনে রাখুন আমাদের ঘরগুলো দেশদ্রোহীদের লুকিয়ে থাকবার আস্তানা হিসেবে ভাড়া দেওয়া হয় না।

এতখানি আশা করেনি অতনু। অপ্রস্তুত হয়ে বলে : তাহলে এটাকা তুমি—

: না। নেব না। আপনার সঙ্গে আমাদের সংসারের পরিচয় এমন কিছু ঘনিষ্ঠ নয় যে আপনার কাছে সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। অপমানে রাঙা হয়ে উঠেছে অনুরূপা।

প্রত্যাখ্যানে অতনুব ব্যক্তিত্ব আহত হয়। তাই সে ঘুরিয়ে বলে : যদি বলি এ টাকা বড়লোকের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা।

অনুরূপা নির্লিপ্তকণ্ঠে জবাব দেয় : ছিনিয়ে আনা হতে পারে। তবে গরীবদের জন্যে নয়। এর পেছনে হয়ত অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে। আমি শুধু এটুকু জানি আপনি রবিনহুড নন, রঘুডাকাতও নন।

অনুরূপার কথাগুলো অতনুর সর্বাঙ্গে যেন চাবুক মারল। নির্বাক নিস্পন্দ

হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অতনু। জীবনে কোন মেয়ের কাছে এমন ধরনের কথা সে শোনেনি। ভক্তি আদায় করেছে সে গায়ের জোরে। ভালবাসা আদায় করছে টাকাব জোরে। তার দয়াব দান প্রত্যাখ্যান করার সাহস করেনি কেউ কোনদিম। কিন্তু আজ? সে ভীষণভাবে হেরে গেছে এই গর্বিতা মেয়েটির কাছে।

দবজার দিকে এগোতে থাকে অতনু।

নিঃশব্দে পিছনে আসতে আসতে অনুরূপা বলে: অপরাধ নেবেন না। উপযাচক হয়ে উপকাব নাই বা করলেন। ভিক্ষাব ঝুলি নিয়ে যদি কোনদিন পথে দাঁড়াই, তাহলে সেইদিনই দয়াব দানে ভরে দেবেন আমাব ভিক্ষাপাত্র।

অতনু যেতে যেতে শোনে অনুরূপাব কথাগুলো। কোনো জবাব দেয় না। ঘব থেকে বাইবে গিয়ে সে একবাব ফিবে তাকায় অনুরূপাব দিকে। অতনুব চোখে বিস্ময। অনুরূপার চোখে আগুন। আর কোন কথা নেই তাদেব।

অতনু বলে: চলি।

: আসুন। অনুরূপাব কণ্ঠ শান্ত।

॥ ছয় ॥

সৃষ্টিছাড়া চরিত্র অতনু। জমিদার অজিতপ্রসাদ মল্লিকের একমাত্র সন্তান। শেষ বয়সের সন্তান বলে প্রচুর ভোগে আর আদরে কেটেছে অতনুর ছেলেবেলা। অজিতপ্রসাদও ছিলেন অত্যন্ত ভোগী আর উচ্ছৃঙ্খল। আজ তিনি নামেই জমিদার। তিনমহলা বসত বাড়িখানা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই তাঁর। অত্যাচারী জমিদার যৌবনের উন্মাদনায় হাতে চাবুক নিয়ে উৎপীড়ন করেছেন নিরীহ প্রজাদের ওপর। হয়ত সেই অত্যাচারের বীজই লুকিয়ে আছে অতনুর রক্তে।

অবাধ্য অতনু যখন পঙ্কিলতার পথে এগিয়ে যাচ্ছিল সেই সময়েই এক বন্ধুর কন্যা জয়াকে পুত্রবধূ করে ঘরে নিয়ে এলেন অজিতপ্রসাদ। জয়া অতনুরও ছিল পূর্বপরিচিতা। কিন্তু ঘরের মোহ ভুলিয়ে রাখতে পারল না অতনুকে। তার চাই টাকা। ভোগের জন্যে বিলাসের জন্যে উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যে চাই প্রচুর টাকা। কিন্তু কোথা থেকে টাকা আসবে? ক্রমে অতনুর পরিচয় হয় রামলাল গোয়েঙ্কার সঙ্গে হোটেল গ্রীন্-এ যাতায়াতের ফলে। রামলালের সঙ্গে মিশে সে পায় পথের নিশানা। জীবনের আঁধার পথে টাকা রোজগারের অভাবনীয় সুযোগ। পিছনে পড়ে রইল তার বংশমর্যাদা। পিছনে পড়ে রইল নববিবাহিতা জয়া। নিজের খেয়ালে পথ চলে অতনু। অপরাধের যে বীজ লুকিয়ে ছিল তার ভেতরে, সুযোগ পেয়ে অঙ্কুরিত হল তা।

মাঝে মাঝে নেশার ঝোঁকে বাড়িতে যায় সে। আবার চলে আসে। আবার নেমে আসে পথে।

একমাত্র ছেলের এই অবস্থা দেখে এবং হতভাগ্য জয়ার কথা স্মরণ করে অনিদ্রা রোগে ভুগছেন অজিতপ্রসাদ। বয়স তাঁর সত্তর পেরিয়ে গেছে। বার্ধক্যের ছাপ সারা দেহে প্রতীয়মান। দিনরাত তাঁর চিন্তা। এতটুকু ঘুম নেই চোখে। গভীর রাত্রে বিরাট ঘরখানায় পাগলের মত পায়চারি করেন তিনি। আর ভাবেন পুত্রবধূ হতভাগ্য জয়ার কথা।

অপূর্ব সুন্দরী জয়া। স্নিগ্ধ একটা কমনীয়তা তার সারা দেহে। শান্ত সংযত তার কথাবার্তা। স্বপ্নভরা দুটি চোখ। সে চোখে অজস্র বেদনা থাকলেও সেবার ত্রুটি নেই জয়ার। সমস্তক্ষণ সে থাকে অজিত-প্রসাদের কাছে কাছে। যখন যা প্রয়োজন, হাতের কাছে জুগিয়ে দেয় সব।

অজিতপ্রসাদ সোফায় বসে পড়েন। হাতে একপাত্র পানীয় নিয়ে জয়া ঘরে ঢোকে।

ঃ বাবা। আপনার ওভালটিন।

ঃ কে? বৌমা! মুখ ফিরিয়ে অজিতপ্রসাদ বলেন।

ঃ আপনার ওভালটিন এনেছি বাবা।

ঃ ও। দাও।

ওভালটিনের পাত্রটা নিয়ে পাশে টেবিলের ওপর রেখে দেন তিনি।

ঃ এটা খেয়ে শুয়ে পড়ুন বাবা। রাত প্রায় এগারোটা হল।

ঃ শুয়ে কি করব মা? সমস্ত রাত যে দুচোখের পাতা এক করতে পারিনা। খোকা যেদিন চলে যায় তোমাকে ফেলে সেইদিন থেকেই ঘুচে গেছে সব ঘুম।

বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিয়ে জয়া বলে ঃ আমার ভাগ্যে যা ছিল তাই হয়েছে। আমার জন্যে মিছিমিছি আপনি কষ্ট পাচ্ছেন কেন? নিজের ভুল বুঝতে পারলে তিনি আবার ফিরে আসবেন।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন অজিতপ্রসাদ।

: কিন্তু বৌমা। আমি যে শপথ করেছি আমার জীবদ্দশায় এ বাড়ির দরজা তার জন্যে বন্ধই থাকবে। আমি তাকে ক্ষমা করতে পারব না।
চুপ করে এককোণে দাঁড়িয়ে থাকে জয়া। জয়া জানে কেন বৃদ্ধ আজ এত কঠোর হয়েছেন। কিছুদিন আগে অতনুর খোঁজে পুলিস আসে এ বাড়িতে। এখানে তার সন্ধান না পেয়ে তল্লাসী পরোয়ানা এনে সারা বাড়িটা তন্ন তন্ন করে খোঁজে পুলিসেব লোক। তাদেব জুতোর এক একটা শব্দ এক একটা ভাবি পাথরেব মত ধাক্কা মেরেছে অজিত-প্রসাদের বুকে। সম্মানে আব আভিজাত্যে লেগেছে প্রচণ্ড আঘাত। তাই স্নেহের দৈন্যে আব তিনি কাতর নন। যৌবনের সেই কঠোবতাই আবার ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন নিজের মধ্যে।
জয়াকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে উঠে গিয়ে অজিতপ্রসাদ বলেন: কি বৌমা! সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীব দেশের মেয়ে তুমি। অন্যায়েব বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পাববে না?
চুপ করেই দাঁড়িয়ে থাকে জয়া। কথা বলে আহত মানুষটাকে আরও উত্তেজিত করতে তার মন চায় না।
জয়ার দিকে ফিরে তাকিয়ে অজিতপ্রসাদ বলেন: যাক, যদি ও ফিবে আসে তুমি ওকে ক্ষমা কোর।
: আপনি এত ভাববেন না বাবা। অনুযোগের সুবে জয়া বলে।
কাছে এগিয়ে এসে জয়ার মাথায় একখানি হাত বেখে অজিতপ্রসাদ বলেন কাতরভাবে: আমার যে বড় কষ্ট হয় মা তোমার জন্যে। সংসারের সুখ থেকে বঞ্চিত হয়েও এমন সেবায় তুমি তুষ্ট করছ আমাকে। কিন্তু, তোমার কাছে আমি যে কত অপরাধী—
একথায় সঙ্কুচিত হয় জয়া।
: আপনি একথা বলে আমাকে আর লজ্জা দেবেন না বাবা।
কোন কথা না বলে খোলা জানালার ধারে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন অজিতপ্রসাদ দূরের পথের দিকে চেয়ে। দুজনেই তারপর

নীরব। শুধু বিরাট বড় দেওয়াল ঘড়িটায় বিশ্রী রকমের টিক টিক শব্দ হতে থাকে।
ঝি এসে সংবাদ দেয় জয়ার আহারের আয়োজন সম্পূর্ণ। অজিত-প্রসাদের বিছানাটা ঠিক করে গুছিয়ে দিয়ে সে চলে যায়।

রাত বাড়ে। অজিতপ্রসাদ আবার পায়চারি করতে থাকেন। মাঝে মাঝে দুহাত দিয়ে নিজের চুলগুলো টানতে থাকেন। শূন্য দৃষ্টিতে সারা ঘরখানা দেখতে থাকেন। ঘরেব দেওয়ালের রঙগুলোতেও পড়েছে বয়সের ছাপ। ঝাড়লণ্ঠন তিনটে ঝুলছে। প্রচুর ঝুল জমেছে তাতে। কত দিন কতকাল সেগুলো স্পর্শ কবা হয়নি। ধূলো জমেছে এ বাড়ির বড় বড় সব অয়েল-পেন্টিংগুলোতে। হারানো দিনের স্মৃতি বহন করে তারা সবাই যেন চেয়ে দেখছে আজকের নিঃস্ব অজিতপ্রসাদের দিকে। দেখছে ভাঙনের এই বিচিত্র প্রহসন। দেখছে সে বংশের রিক্ত জমিদার অজিতপ্রসাদকে।
সত্যিই আজ তিনি নামেই জমিদার। পুরুষানুক্রমের মামলা-মোকর্দমায়, নিজের সারা জীবনেব ভোগ-বিলাস আর উচ্ছৃঙ্খলতায় কলসির জল গড়িয়ে গড়িয়ে খালি হয়ে গেছে। আজ শুধু পোশাক-পরিচ্ছদে জমিদারির তকমা এঁটে সাধারণ জীবনযাপন করা ছাড়া গতি নেই।
আজকের এই অবস্থার জন্মে অনেকটা দায়ী অজিতপ্রসাদ। দায়ী তাঁর কর্মফল। আজ পলিতকেশ বৃদ্ধকে বাইরে থেকে দেখে মনে হয় অফুরন্ত দয়ার ভাণ্ডার বুঝি লুকিয়ে আছে তাঁর মাঝে। কিন্তু তা ভুল। যৌবনে অত্যাচারে উৎপীড়নে প্রজাদের চোখের জল এক বিন্দুও করুণা আনতে পারেনি তাঁর মনে।
রোম নগরী জ্বালিয়ে দিয়ে নিরো একদিন বীণা বাজিয়েছিল। প্রজাদের সাতপুরুষের বাস্তুভিটে নীলাম করে দিয়ে অজিতপ্রসাদ তৈরি করেছিলেন নাট-মহল আর জলসা-ঘর। নিজের স্ত্রীর দিকে

তখন তিনিও ফিরে তাকাননি। আমোদ-প্রমোদেই মেতে থাকতেন সারাক্ষণ। দিনান্তে হয়ত একবার দেখা হতো স্ত্রীর সঙ্গে। বাকি সময় মেতে থাকতেন গানবাজনার আসরে। শেষ পর্যন্ত উচ্ছৃঙ্খলতার অতল তলে তলিয়ে গিয়েছিলেন সুর আর সুরা আশ্রয় করে। যখন ভাবতে শিখলেন যে জীবনটা শুধু ফুর্তি করে কাটাবার জন্যে নয় তখন দেখলেন তিনি জমিদার বটে কিন্তু জমিদারি আর নেই।

অজিতপ্রসাদ ভাবতে থাকেন সেই সব পুরানো দিনের কথা। আর ভাবেন, সেই উচ্ছৃঙ্খলতার বীজই হয়ত লুকিয়ে আছে অতনুর রক্তে রক্তে। সেই অত্যাচার আব উৎপীড়নেব লালসাই তো ঘুমিয়ে আছে তার অন্তরে। কিন্তু তা চরিতার্থ করবার মতো অর্থবল আর অবশিষ্ট নেই। তাই কি ও বেছে নিয়েছে এই আঁধার পথ?

ভাবতে ভাবতে তন্দ্রা আসে অজিতপ্রসাদের। নীবব রাত্রে সে ঘরে জেগে থাকে ঘড়ি। অনেক দিনের ঘড়িটার টিক টিক শব্দ বড় ক্লান্ত শোনায় সেই স্তব্ধ রাত্রে।

রাত তখন প্রায় বারোটা।

অজিতপ্রসাদের ঘর থেকে চলে এসে জয়া আহার সেরে নিয়েছে। নিজের ঘরে এসে একখানা পত্রিকা নিয়ে দেখতে থাকে সে। আজকের দিনটির দাম তার জীবনে অনেক। এমনি একটি দিনেই অতনুব সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। সে দিনটি তার কাছে আনন্দেরও যত, বেদনারও তত। তবু তা অনন্য। তবু তার চেহারা আলাদা।

ছোকরা চাকরটা কিছু আগে ছুটি নিয়ে চলে গেছে। কামারপাড়ায় যাত্রা হচ্ছে। যাত্রা দেখতে চলে গেছে সে। আর বাকী সব ঝি-চাকর শুয়ে পড়েছে।

শুধু ঘুম নেই জয়ার চোখে। আজ সকাল থেকেই তার মনটা ছিল

অস্থির আর চঞ্চল। চাকরকে দিয়ে বিকেলবেলায় আনিয়ে রেখেছিল একটা বেলফুলের মালা। দেওয়ালে টাঙানো ছিল তাদের বিয়ের একটা ফটো। সেই ফটোর ধারে কাছে সুগন্ধি ধূপ জ্বেলে দিল জয়া। তারপর ফুলের মালাটা নিয়ে সন্তর্পণে সেটি ঝুলিয়ে দেয় ছবিখানায়। ঝপ করে একটা শব্দ হতেই চমকে পিছন ফিরে দাঁড়ায় জয়া। আনন্দে উত্তেজনায় বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায় সে। জানলা টপকে অতনু এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের মাঝে। ছুটে এসে জয়া বলে : ওগো তুমি এসেছ !

উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে থাকে জয়া। আবেগে আরক্ত তার মুখ।

সেদিকে লক্ষ্য নেই অতনুর। খুব বিমর্ষভাবে বলে সে : এসেছি। তবে নিজের প্রয়োজনে।

স্বামীর হাত দুটো চেপে ধরে জয়া।

: বলো, কী তোমার প্রয়োজন। আমি প্রাণ দিয়েও তোমার প্রয়োজন মেটাব।

: এক হাজার টাকা চাই। এই মুহূর্তে।

বিছানায় বসে একটা সিগারেট ধরায় অতনু।

একথাটা ভাবতে পারেনি জয়া। কিন্তু কিছু না ভেবে যে প্রতিশ্রুতি সে দিয়েছে তাও তো রাখতে হবে। অতনু আজ তাকে কী কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে জয়া বলে : টাকা ? টাকা তো আমার কাছে নেই। আজ রাতটার মতো থাকো। কাল সকাল হলে বাবাকে যা হোক কিছু বলে ব্যবস্থা করে দেব।

কথা কেড়ে নিয়ে অতনু বলে : আমার অনেক কাজ। তাছাড়া চারিদিকে পুলিস।

: থাক তোমার চারিদিকে পুলিস। তাদের সাধ্য নেই আমার কাছ থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

দুহাত দিয়ে অতনুর ডান হাতখানা চেপে ধরে জয়া।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অতনু বলে : বাজে সময় নষ্ট কোরো না। বলো টাকা দেবে কি না।

এ কথায় জয়ার রাগ হয় না। শুধু অভিমানে ভেঙে পড়ে সে। নিজেকে অত্যন্ত মূল্যহীন মনে হয়। নিজেকে সে পরাজিত মনে করে। ব্যথিত হয়ে বলে : এক হাজার টাকার বিনিময়েও আমি তোমার একটা দিনের সান্নিধ্য পাব না?

: না। পাবে না। পাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া, তোমার অভাব কিসের? রাজরানী হয়ে রয়েছ এই বিরাট প্রাসাদে--

তাকে থামিয়ে দিয়ে ব্যথাভরা কণ্ঠে জয়া বলে ওঠে : চাই না। চাই না আমি রাজরানী হয়ে থাকতে। শুধু তুমি থাকো আমার কাছে।

: অভিনয় আপাততঃ বন্ধ রাখো জয়া।

কঠোর গলায় বললে অতনু।

সে কথা শুনে জয়ার চোখে জল এল। মুখে তার আর কোন কথা নেই। ন্যায্য পুরস্কার সে পেয়েছে। তার আশার, তার আকাঙ্ক্ষার, তার ভালবাসার পুরস্কার সে পেয়েছে। সেই পুরস্কারই তার চোখে জল এনে দিয়েছে।

অতনু উঠে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো জিজ্ঞাসা করে : তাহলে টাকা তুমি দেবে না?

কোন কথা না বলে জয়া তার গলার হার আর হাতের চুড়িগুলো খুলে অতনুর হাতে দিল। কাঁদতে কাঁদতে বললে : আজ সাতাশে শ্রাবণ। আমাদের বিয়ের তারিখ আজ। ফুলে চন্দনে আজ তোমাকে সাজাব বলে—

: আমি আসব তা তো তুমি জানতে না। সাজাতে তো আমার ওই প্রতিকৃতিখানা।

এ কথায় আরও আঘাত পায় জয়া। তবুও বলে : যখন এসেছ তখন—

ঃ তার কোন দরকার নেই। ছবিখানাকেই সাজিও

যে পথে এসেছিল সেই পথেই চলে গেল অতনু। নিশ্চল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকে জয়া। কান্নায় ধুয়ে যায় তার মুখখানা। স্খলিত পায়ে কোন রকমে এগিয়ে এসে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে বিছানায়। অশ্রুর বন্যায় ভেসে যায় বালিশটা।

॥ সাত ॥

রাত্রির পর দিন। আবার দিনের পর রাত্রি। যথানিয়মে চলে হোটেল গ্রীন। খরিদ্দারের ভিড় হয়। চিন্তাশীল লোক, ফাট্‌কা-ব্যবসায়ী, নানান শ্রেণীর দালাল, চোর, জুয়াচোর, পকেটমার, প্রেমিক সকলের মিলিত কলরবে মুখর হয়ে ওঠে। রামলালের এই বেনামী ব্যবসা চলতে থাকে বিনা বাধায়। নাচ হয়। গান হয়। বাজনাও বাজে। আর, রামলালের আরও কয়েকটা গোপন কারবার চালু হয়। আফিম আর গাঁজার চোরা চালান আজকাল বেশ মোটা পয়সা আনছে ঘরে। এসব মতলব মাথায় দিয়েছিল অতনু। কেনারামও তাকে সাহায্য করছে প্রচুর। অতনু আজকাল ঘুরে বেড়ায় ভারতের সর্বত্র। আজ বিহার, কাল উড়িষ্যা, পরশু পাঞ্জাব।

কয়েকদিন কলকাতার বাইরে কাটাবার পর এক রাতে ঝড়ের মতো উদয় হয় অতনু। হোটেলে এসে অরূপের খোঁজ করে সে। শোনে গত দুদিন ধরে আসছে না অরূপ।

কোন্ খেয়ালে অরূপের অনুপস্থিতির সংবাদ জানার সুযোগ নিয়ে পরের দিন সে হাজির হয় বিশ্বনাথ মতিলাল লেনে তাদের সেই ভাঙা বাড়িতে। করুণা সাদর অভ্যর্থনা জানান তাকে।

কিছুক্ষণ একথা সেকথার পর অতনু বোঝে যে হরিনারায়ণের অসুখটা রাত্রের দিকে কদিন বাড়ছিল বলে অরূপ কাজে যেতে পারেনি। আজ একটু ভাল আছেন বলে মনে হচ্ছে ; আজ থেকে হয়ত যেতে পারবে।

সব শুনে অতনু বলে : এখন তাহলে ভাল আছেন ?

: হ্যাঁ। ভোরের দিকে একটু ঘুমিয়েছেন।

: অরূপ কোথায় ?

: সে ডাক্তারের কাছে গেছে ওষুধ আনতে।

আরও কিছুক্ষণ গল্প করার পর করুণা চলে যান সংসারের কাজে। রোগীর আহার্যের বন্দোবস্ত করতে হবে তাঁকে।

অতনু চুপচাপ বসে এদিকে সেদিকে দেখতে থাকে। এক সময়ে অনুরূপা চায়ের পেয়ালা হাতে ঘরে ঢুকে বলে : নমস্কার অতনুবাবু, আজ আবার পুলিস পিছু নেয়নি তো!

চমক ভাঙে অতনুর। যথাসম্ভব সহজ হবার চেষ্টা করে বলে : আমাকে এভাবে অপমান করবার মানে ?

: অপরাধ ক্ষমা করবেন। দয়াপরবশ হয়ে সাত সকালে কুশল সংবাদ নিতে এসেছেন ভাবতেই পারিনি।

: আমার মনে হচ্ছে আমাকে আঘাত দিয়ে তুমি আনন্দ পাও।

অনুরূপার মুখে অদ্ভুত একটা হাসি। সুন্দর আর দুর্বোধ্য। আধো-অন্ধকার ঘরখানায় সে হাসি রহস্যময়। অনুরূপা বলে : আপনি কি ভেবেছিলেন আপনাকে আনন্দ দিয়ে আমি আঘাত পাব ?

: তোমার হেঁয়ালি আমি বুঝতে পারছি না। আমার মনে হচ্ছে সে দিনের মতোই অপমান আমাকে সইতে হবে।

: বলতে পারি না। তবে আমাদের অপমান করার মতো কোন কাজ করলে সম্মান হয়ত পুরোপুরি দিতে পারব না।

অনুরূপা বসে পড়ে অতনুর কাছাকাছি একটা চেয়ারে। অতনুকে চুপ করে থাকতে দেখে বলে : কেন ? আজ আবার কি সাহায্য করতে চান নাকি ?

অতনু জবাব দেয় : না। সে স্পর্ধা আমার নেই। নতুন করে

আর সে ভুল আমি করব না। কিন্তু তোমাদের সংসারেব যা অবস্থা দেখছি—
: দয়া করে আপনাকে ভাবতে হবে না। যাদের বোঝা তারাই বইবে। খুব সহজভাবে হাত জোড় করে অনুরূপা বললে।

তারপর কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব। অনুরূপা আবার শুরু করে: দেখুন অতনুবাবু, হাত পেতে কারও দয়াব দান নিতে চাইনা। দিনের পর দিন যা পরিস্থিতি হয়ে উঠছে তাতে শেষ পর্যন্ত হয়ত আমাকেও চাকরি করতে হবে।
: চাকরি ? বিস্ময়-বিস্ফাবিত চোখে তাকায় অতনু।
: হ্যাঁ, চাকরি। অবাক হবাব কি আছে ?
মুহূর্তের জন্যে অতনু কি একটা ভেবে নিল। তাবপব বললে: না, অবাক হইনি। ভাবছি, চাকরিই যদি কবতে হয় তাহলে যে লাইনে তোমার টেস্ট আছে সেই লাইনে যাওয়াই ভাল।
অতনুর মুখ থেকে হঠাৎ এ ধরনের কথা শোনায় অনুরূপার মুখে চিন্তার রেখা ফোটে। বলে: আপনাব কথাটা ঠিক বুঝে উঠতে পাবছি না।
অতনু নির্লজ্জ চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে অনুরূপাকে। তার মনে তখন ঘুবছিল বামলালেব ফিল্ম কোম্পানি। নায়িকা। আর, সেই শর্ত। ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি।
: আমি বলছিলাম কি, নাচে গানে তুমি অদ্বিতীয়া। দেহ-সৌন্দর্যেও তুমি—
একটু থেমে আবাব বলে: তুমি যদি ফিল্মে অভিনয় করবার সুযোগ পাও ?
অতনু সুবিধা বুঝে বললে: টাকা নিশ্চয়ই পাবে। প্রয়োজনের অতিরিক্তই পাবে। কোম্পানির সঙ্গে কনট্র্যাক্ট করলেই মোটা টাকা অ্যাডভান্স পেয়ে যাবে।

অনুরূপা নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। প্রলোভন তার নেই। প্রয়োজনও তার অতি অল্প। প্রয়োজন শুধু সংসারটাকে বাঁচিয়ে রাখার। শুধু অক্ষম হরিনারায়ণকে সারিয়ে তোলার প্রয়োজন। কিন্তু সে প্রয়োজন মেটাতে অভিনেত্রীর জীবন বেছে নিতে হবে এতে সায় দেয় না অনুরূপার মন। দোষের কিছুই নেই। অভিনেতারা মানুষ। অভিনেত্রীরাও নারী। কিন্তু আজন্ম এক রক্ষণশীল পরিবারে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের আড়ালে বেড়ে উঠে এ জীবিকা তার স্বপ্নাতীত। এই অজানা জগতের বিষয়ে অনেক সে শুনেছে। সে জগতের কথা যেন রূপকথারই সামিল। সেখানে জীবন আছে। মৃত্যুও আছে। আনন্দের শিহরণ আছে। আনন্দের মাঝে আছে শঙ্কা। সেখানে মান আছে কিন্তু অপমান? তাও তো থাকতে পারে।

অনুরূপাকে ভাবতে দেখে অতনু বলে: তাহলে রাজী?

সম্বিত ফিরে পায় অনুরূপা। বেত্রাহত বালিকার মত নড়ে ওঠে তার সারা দেহ।

: অ্যাঁ,। ও, যে কথা বলছিলেন?

: হ্যাঁ। রাজী তো?

: ভেবে দেখি। আমার রূপ যৌবন আর অভিনয় দেখে লক্ষ লোক হাততালি দেবে। সে জ্বালা আমি সইতে পারব কিনা একবার ভাল করে ভেবে দেখতে হবে আমাকে।

এ কথায় একটু অবাক হয় অতনু। অনুরূপার প্রতিটি কথাই ধারালো। বিষের তীরের মতোই তার জ্বালা। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া অতনুর মনে শুধু একটা মুহূর্ত ঢেউ তোলে তা। সঙ্গে সঙ্গে আবার স্থির। মন থেকে সেন্টিমেন্টকে অতনু নির্বাসন দিয়েছে বহুদিন আগে। সহজ হয়ে রুমাল দিয়ে মুখটা মুছতে মুছতে অনুরূপার মুখ থেকে চোখ সরিয়ে অতনু বলে যায়: ভাল করেই ভেবে দেখো

অন্ন। বাঁচবার এবং বাঁচাবার দায়িত্বেই তুমি অভিনেত্রী-জীবন বরণ করে নিচ্ছ।

ঃ ভাবছি বাঁচাতে হয়ত পারব কিন্তু বাঁচার মতো বেঁচে থাকতে পারব কিনা।

উঠে দাঁড়িয়ে অতনু বলেঃ ঠিক আছে। ভেবেই স্থির কোরো। তারপর গলার স্বর কিছু নামিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে অনুরূপার কাছে এসে অতনু বলেঃ তোমাদের এখন বড় বিপদের সময় দেখতে পাচ্ছি। আপাততঃ ধার হিসাবেই এই টাকাটা না হয় রেখে দাও।

পকেট থেকে বেশ কয়েকখানি দশটাকার নোট বার করে অনুরূপার হাতে দিতে উদ্যত হয় অতনু। অনুরূপা দুপা পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়ায়। একটা ম্লান হাসির রেখা তার অধরোষ্ঠে। সে ম্লানিমা একটা-অপূর্ব সুষমা ছড়িয়ে দিয়েছিল তার সারা মুখে। আস্তে আস্তে বললে অনুরূপাঃ ধার দেওয়ার মতো টাকা আপনার আছে জানি। কিন্তু শোধ করবার যার সঙ্গতি নেই, ধার নেওয়ার দুঃসাহস তার না থাকাই ভাল।

এর জবাবে আর কোন কথা বলেনি অতনু। টাকা কটা পকেটে রেখে দিয়েছিল। অনুরূপা আরও দুপা পিছিয়ে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। উন্মুক্ত আকাশ দেখা যায় না সে জানালা দিয়ে। দৃষ্টি আটকে যায় অন্য বাড়ির দেওয়ালে। অনেক বাধা পেরিয়ে সূর্যের যেটুকু আলোর আভা এসে পড়ে তাতে বোঝা যায় আকাশ আছে, তবে অনেক দূরে। অনুরূপার চোখদুটো গবাক্ষের বাইরে খুঁজছিল সেই আকাশ। সেই অনেক দূরের আকাশ। আর খুঁজছিল আলো। অনেক আলো।

আর অতনু চুপ করে দাঁড়িয়ে শান্তভাবে একটা সিগারেট ধরায়। তারপর কাঁধটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ধীরে ধীরে চলে যায় অনুরূপাকে

কিছু না বলেই। অনুরূপা বাইরের দিকে তাকিয়ে জানালার ধারে তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে অরূপ এসে ঘরে ঢোকে। ডাকে ঃ দিদি—
ডাক শুনে ফিরে দাঁড়ায় অনুরূপা। কাছে এসে হাত পাতে।
ঃ এনেছিস ?
ঃ না। পবন পোদ্দার বললে এ রেখে অত টাকা দেবে না। এগুলো গিল্টি।
জামার পকেট থেকে কয়েক গাছা চুড়ি বার করে দিদির হাতে দেয় অরূপ। অনুরূপা সেগুলো হাতে নিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দুহাত মুঠো করে। সে অসহায় অবস্থা দেখে চোখে জল আসে অরূপের। আর কোন কথা বলতে পারে না অরূপ। ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সে।
কোনরকমে ঘরের মাঝে একটা চেয়ারে বসে পড়ে অনুরূপা। মাথায় হাত দিয়ে চোখদুটো বন্ধ করে ভাবে। দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ হয় ক্ষণকাল পরেই। উঠে দাঁড়িয়ে দরজার কাছে গিয়ে দেখে বাড়িওয়ালা তালুকদার হিংস্র চোখে দাঁড়িয়ে।
খর্ব মোটাসোটা চেহারা তালুকদারের। বাহির বিশ্বের কোন খবরই সে রাখে না। রাজ্যের কোন উত্থান-পতন কোন শৃঙ্খলা-বিশৃঙ্খলার ধার ধারে না সে। বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতবর্ষ কতদূর অগ্রসর হয়েছে বা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কী তাও তার অজানা। তালুকদার শুধু তালুক বোঝে। বিপত্নীক তালুকদার ইদানীং খুব খিটখিটে হয়ে গেছে।
অনুরূপা সামনে এসে দাঁড়াতেই তার দৃষ্টির হিংস্রতা অপসারিত হয়ে কেমন একটা লালসা ফুটে ওঠে চোখেমুখে। কুৎসিত দৃষ্টি দিয়ে

অনুরূপার সর্বাঙ্গ যেন লেহন করতে থাকে তালুকদার। হাত কচলে আমতা আমতা করে বলে ঃ অরূপবাবু বাড়ি আছে নাকি ?
ঃ অরূপ আবার বাবু হলো কবে থেকে ?
রোষের সঙ্গে পাল্টা প্রশ্ন করে অনুরূপা।
বিশ্রী একটা হাসি ফুটে ওঠে তালুকদারের মুখে। বলে ঃ এখন চাকরি করছে। পয়সা রোজগার করে সংসার চালাচ্ছে। এখন তাকে অরূপবাবু না বললে তার কি মান থাকবে ?
মুখে একটা বিদ্রূপের হাসি থাকলেও বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে কথাগুলো বলছিল তালুকদার। সে কথায় অনুরূপার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে অনুরূপা বলে ঃ একটু আস্তে কথা বলুন। বাবার অসুখ বেড়েছে। কাল সারারাত ছটফট করে ভোরে একটু ঘুমিয়েছেন। আপনার চিৎকারে ঘুমটা না ভাঙলেই বাঁচি।
পানের ছোপধরা দাঁতগুলো বার করে বোকা হাসি হাসে তালুকদার।
ঃ ওহো। তুমি তাহলে নিরিবিলিতে কথা কইতে বলছ। তা বেশ।

অনুরূপা আর সহ্য করতে পারে না এই অসভ্য ইতরটাকে। কঠিন হয়ে সে বলে ঃ ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন কিন্তু। এমনি ধরনের কথা ভবিষ্যতে উচ্চারণ করলে তার যোগ্য ব্যবস্থা করব।
তালুকদার অবাক হয়ে যায় অনুরূপার কথা শুনে। এমন ভাবে অপমানিত হবে সে ভাবতে পারেনি। সকালে গঙ্গা স্নান সেরে কপালে চন্দনের টিপটি পরে অনুরূপার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এসেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই অসম্মান! রাগে উত্তেজনায় গায়ের লোমগুলো খাড়া হয়ে ওঠে তালুকদারের।
ঃ ও। এত তেজ ! বিষ নেই, কুলোপানা চক্কর আছে। তোমার ওই ক্যাটকেটে কথার আমি ধার ধারি না। শোন, পাওনা টাকা

আদায় করতে আসার সময় অসময় নেই। পাওনাদার দুপুরও মানে না, দুপুররাত্রিও মানে না। অনেক সহ্য করেছি। আর না।
রাগে ছাতাটা মাটিতে ঠুকতে থাকে তালুকদার। পরিবেশটা ক্রমশ অসহ্য হয়ে ওঠে অনুরূপার কাছে। দরজাটা বন্ধ করতে উদ্যত হয় সে। বন্ধ করতে করতে বলে ঃ আশা করি আপনার কথা শেষ হয়েছে।
ঃ হ্যাঁ হয়েছে। আর কিছু কথা নেই। দেখা হবে একেবারে আদালতে। আমার নাম ত্রৈলোক্য তালুকদার।
সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দেয় অনুরূপা। সেই সময়ে করুণা এসে দাঁড়ান সেখানে। ভিজে কাপড় পরে তিনি দাঁড়িয়েছেন। মেয়েকে দেখেই বোঝেন একটা কিছু অঘটন ঘটেছে। তাই জিজ্ঞাসা করেন ঃ কার সঙ্গে কথা বলছিলি রে?
ঃ বাড়িওয়ালা এসেছিল। ভব্যতার সীমা পেরিয়ে যাচ্ছিল বলে উচিত কথা বলে বিদায় করেছি।
শঙ্কিত হয়ে করুণা বলেন ঃ বেশ করেছ। খুব ভাল কাজ করেছ। এখন কোর্ট-ঘর কোরো।
মার হাত দুখানা চেপে ধরে অনুরূপা বলে ঃ মা, তুমি আমার অন্যায়টাই দেখলে আর আমার ওপরই রাগ করলে।
পিছন ফিরে যেতে যেতে করুণা বলেন ঃ না মা। তোমাদের কারও ওপর রাগ করিনি। রাগ শুধু আমার অদৃষ্টটার ওপর।
করুণা চলে যান। অনুরূপা দাঁড়িয়ে ভাবে কারও কোনও অপরাধ নেই। অপরাধ তার নিজের। দরিদ্রের সংসারে জন্ম নেওয়ার অপরাধ। আগুনের মতো রূপ আর যৌবনের অধিকারিণী হওয়ার অপরাধ। মেয়ে হয়ে জন্মানোয় নিজের অসহায়তার অপরাধ।
আর ভাবে এর প্রায়শ্চিত্ত কী? এ অপরাধের মুক্তি কোথায়?

॥ আট ॥

হোটেল গ্রীনএর প্রতিষ্ঠা উৎসব সেদিন। রঙীন কাগজের ফুল আর অজস্র রঙীন বেলুন দিয়ে সাজানো হয়েছে হোটেল গ্রীন। অপূর্ব নাচ আর বাজনার সমারোহ। অনেক লোকের ভিড় সেখানে। বাজার খুব ভাল। আগের দিনের বিক্রিও আশাতীত। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত হোটেল খোলা রাখবার অনুমতি ছিল পুলিস থেকে। আজও আছে সেই বিশেষ অনুমতি। রামলালেব মেজাজটাও খুব খুশি খুশি। বজ্রপানি আর অতনুকে দুপাশে বসিয়ে কাজকারবারেব কথা বলতে থাকে রামলাল।

রাত্ত ক্রমে বাড়তে থাকে। ভিড়েরও অন্ত নেই। ঘড়িতে এগারোটা বাজার শব্দ হয়। অকস্মাৎ একদল পুলিস সহ জনৈক অফিসার প্রবেশ করেন। সবার পিছনে আসে ইনস্‌পেক্টব রজত। ম্যানেজারের কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়ায় তাবা। অতনু অবস্থা বুঝে রামলালকে নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। বজ্রপানি এগিয়ে গিয়ে কাউন্টারের সামনে দাঁড়ায়।

পুলিস অফিসার জিজ্ঞাসা করেন : হোটেলের মালিকের নাম কি ?

: আপনাদের খাতাতে সে নাম তো আছে। লাইসেন্সের বইটা দয়া করে দেখে নেবেন।

বজ্রপানি ধীরভাবে কথাগুলো বলে।

অফিসার তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেন : আপনার পরিচয় জানতে পারি ?

ঃ নিশ্চয়ই পারেন। আমি এদের লিগ্যাল অ্যাডভাইজার। নাম বজ্রপানি সিন্‌হা।

ঃ ম্যানেজার মশাইয়ের নামটা জানতে পারি ?

ঃ শেখ তৈমুর আলি।

উত্তর দেয় ম্যানেজার।

পুলিস অফিসার খাতাপত্র দেখে একটা চেয়াবে বসেন। ধীরে ধীরে উপস্থিত লোকজন সবাই সরে পড়ে। অফিসার বলেন ঃ দেখুন, পিয়ারী বাঈ বলে কোন মেয়েকে চেনেন ?

ম্যানেজাব জবাব দেয় ঃ হ্যাঁ। এখানে সে নাচতে আসে প্রতিদিন। তবে, আজকে তাকে আসতে দেখিনি।

ঃ আব কোনদিন সে আসবে না। গম্ভীবভাবে অফিসার বলেন।

ঃ আপনি কি বলছেন আমি বুঝতে পাবছি না।

বিস্মিত হয়ে ম্যানেজাব চেয়ে থাকে তাঁব দিকে।

অফিসার একটা সিগাবেট ধবাতে ধবাতে বলেন ঃ অর্থাৎ, আজ ভোর-রাত্রে তার মৃতদেহ পাওয়া গেছে ময়দানে রেড রোডের ধারে। এন্‌কোয়াবিতে যত দূর রিপোর্ট পাওয়া গেছে, কাল সন্ধ্যায় সে এখানে এসেছিল। যতক্ষণ হোটেল খোলা ছিল এখানেই সে ছিল। অনেক টাকাও নাকি কাল সে উপায় করেছিল। তারপর রাত্রে বাড়িতে ফেরেনি। আজ সকালে কর্পোবেশনের লোক একটা মৃতদেহ দেখে থানায় খবব দেয়। একটু আগে সেই মৃতদেহটির সনাক্তকবণ হয়েছে। পিযারী বাঈএর দেহ। গলা টিপে তাকে খুন করা হয়েছে।

ম্যানেজার বিস্ফারিত চোখে বলে ঃ আশ্চর্য !

ঃ পুয়োর গার্ল।

সমবেদনা জানায় বজ্রপানি।

অফিসার তাদের দিকে চেয়ে বলেন ঃ দেখুন, এ ঘটনা ছাড়াও আরও

অনেক অভিযোগ আছে আপনাদের হোটেলের বিরুদ্ধে। তাই পুলিস কমিশনারের আদেশে এই খুন সম্পর্কে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত হোটেল বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছি। অবশ্য, গ্রেফতারী পরোয়ানা নেই কারও ওপর।

সেই রাত্রেই পুলিস থেকে হোটেল বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিছু কাগজ-পত্র এবং হিসাবের যাবতীয় খাতাপত্র পুলিস হস্তগত করে।

অনুরূপা ভাবে। আকাশ পাতাল ভাবে। হোটেল গ্রীণ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অরূপেরও কাজ নেই। যে কটা টা[illegible] আসছিল তাও বন্ধ হলো। অবস্থা এখন সঙীন। অতনুও রাগ করে চলে গেছে অনেকদিন আগে। তারও কোন সংবাদ নেই। চরম দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় অনুরূপার মনে। সামনে শুধু আঁধার। মসীকৃষ্ণ আঁধার। সে আঁধারে খুঁজে পায় না সে কোন পথের নিশানা।

দিনের অবসান হয়েছে তখন। ততক্ষণে হয়ত তারার মালা সাজিয়ে অন্ধকারের চাদর বিছিয়ে দিয়েছে দূরের আকাশ। হঠাৎ দমকা হাওয়া বইতে শুরু করল। সেই হাওয়া ক্রমে ঝড়ের রূপ নিল। আকাশের তারা গেল নিভে। প্রবল হাওয়া আর বৃষ্টি। তারই মাঝে এগিয়ে চলে অপ্রতিহত কাল। সে থামবে না কারও অনুরোধে। অপেক্ষা করবে না কারও জন্যে। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে এগিয়ে চলবে।

প্রায়ান্ধকার রোগীর ঘরে বসে করুণা প্রহর গুনতে থাকেন। চেয়ে থাকেন সেই চলমান মহাকালের অনন্ত গতির দিকে। বাইরে তখন ক্রন্দসী প্রকৃতি। অঝোর ধারায় কাঁদছে অপ্রকাশ্য বেদনা নিয়ে। কাঁদছে আকাশ। কাঁদছে বাতাস। কাঁদছে বুঝি বনের তরুলতা। বাদলের অকাল নর্তন আর হাওয়ার দাপাদাপি এক মহাপ্রলয়ের

পূর্বাভাস। কিন্তু জল নেই করুণার চোখে। অশ্রুর উৎস তাঁর শুকিয়ে গেছে। স্থির অচঞ্চল হয়ে বসে আছেন হরিনারায়ণের শিয়রের কাছে।

একটা দুঃস্বপ্ন দেখে চমকে জেগে ওঠেন হরিনাবায়ণ।

: কে—কে ?

অস্ফুটে উচ্চারণ করেন : না-না-না।

চমকে ওঠেন করুণা। কাছে এগিয়ে এসে স্বামীর মুখে চোখে হাত বুলিয়ে দেন তিনি। মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করেন : কী হল ? অমন করে চেঁচিয়ে উঠলে কেন ?

: কে ? গিন্নী ?

মাথাটা তুলে করুণার মুখের দিকে তাকান হবিনাবায়ণ।

: হ্যাঁ গো, আমি। কী হয়েছে তোমাব ?

: আমার যেন মনে হল—

: কিছু মনে হয়নি। চুপ করে ঘুমোও।

গায়ে চাদরটা ভাল করে ঢাকা দিয়ে দেন করুণা। মাথায় ও বুকে পেলব হাতখানা দিয়ে সান্ত্বনার প্রলেপ দেন। প্রবল বেগে কাশতে থাকেন হরিনারায়ণ। কিছুতেই আর থামতে চায়না কাশি। বেশ কিছুক্ষণ পরে একটু সামলে নেওয়ার পব হবিনাবায়ণ বলেন : আর পারি না। রাত কত হল ?

: রাত বেশি হয়নি। এইতো সবে দশটা। ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছে। আকাশ অন্ধকার। তাই রাত বেশি মনে হচ্ছে।

: জানো, এ ঝড় বোধ হয় আর থামবে না।

স্বামীর মুখ চেপে ধরেন করুণা।

: ওগো, তুমি ও কথা বোলো না।

করুণার হাতখানা সরিয়ে দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে হরিনারায়ণ বলতে থাকেন : আমার সব কথা ফুরিয়ে গেছে। আমিও তো ফুরিয়ে গেলাম।

কিন্তু তাতে আমার একটুও দুঃখ নেই। দুঃখ শুধু ছেলেমেয়ে দুটোকে মানুষ করে যেতে পারলাম না।

করুণা চুপ করে বসে থাকেন। আর কোন বাধা তিনি দেবেন না কোন কথায়। তিনি জানেন প্রতিবাদ করে এই খেদ এই ক্ষোভ বন্ধ করা যাবে না। অনেকদিনেব সঞ্চিত অনেক কথার পাহাড়ে আজ বিস্ফোবণেব সময় হয়েছে। কোন কথা দিয়েই তাকে আটকে রাখতে পারা যাবে না। যদি বা বন্ধ হয় তা সাময়িক। পাহাড়ের একটা মুখ বন্ধ হলে ভেতবের গলিত লাভা যেমন আপন পথ করে নেয়, আজ হবিনাবায়ণেব সমস্ত আবেগ রুদ্ধ হলে অশ্রুব বিগলিত ধারায় হবে তার প্রকাশ। সে নীরব অশ্রু হবে আরও দুঃখের আবও বেদনার। তার চাইতে এই ভাল। মনেব ভাব যদি কথাব প্রস্রবণে কিছুটা লাঘব হয় তবে তাই হোক। বাধা দেওয়াব নিষ্ফল প্রচেষ্টা না করাই শ্রেয়।

সে বাত্রে অনেকক্ষণ জেগে অনেক কথা শুনতে হল করুণাকে। অনেক প্রশস্তি অনেক কৃতজ্ঞতা। হরিনারায়ণ বললেন, দেশেব জমি জায়গা যা ছিল তা তিনি বিক্রয় কবেছেন কাউকে কিছু না বলেই। ভেবে-ছিলেন আবাব কববেন নতুন সম্পত্তি, আবার বাঁধবেন নতুন ঘর। সে ঘরে লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা করবেন কোনো এক লক্ষ্মীপূজার দিনে। কিন্তু লক্ষ্মীছাড়াব দশা তাঁব ঘুচল না। আরও আশা ছিল অরূপকে মানুষ করে তুলবেন। সে অনেক বড় হবে। অনেক আশা অনেক স্বপ্ন ছিল তাঁব চোখে। বার বাব নিজেব অক্ষমতার কথা বলতে থাকেন তিনি আব দীর্ঘনিশ্বাসে ভারি করে তোলেন রাতেব বাতাস।
সবশেষে হরিনারায়ণ বললেন: নিজেকে নিঃশেষ করেও যদি পারো ছেলেটাকে মানুষ করে তুলো। আর একটা কথা—
চুপ করে অধীর আগ্রহে করুণা তাকিয়ে থাকেন স্বামীর মুখের দিকে।

: শত দুঃখে, শত দারিদ্র্যেও ওই মেয়েটাকে আমি বাঁচিয়ে রেখেছি। কোনো অসম্মান কোনো অমর্যাদা ওকে যেন স্পর্শ না করে। মা আমার বড় দুঃখী বড় অভিমানী।

ধীরে তন্দ্রা আসে হরিনারায়ণের। রাত্রির তৃতীয় প্রহর ভীষণ শান্ত এক গভীর রহস্যঘেরা। মনে হয় কেউ জেগে নেই পৃথিবীতে। আর বুঝি জাগবেনা এই পৃথিবী। মসীকৃষ্ণ অন্ধকারের দিকে চেয়ে মনে হয় আর বুঝি সূর্য উঠবেনা। আব বুঝি প্রভাত আসবে না এই অমানিশার পরে। লক্ষ তারার মানিক জ্বালা অনন্ত আকাশ দেখে মনে হয় এ আকাশ বুঝি এমনিই কালো। আর দেখা দেবে না আকাশের নীল। মেঘের ভেলা আর বুঝি ভাসবে না নীল আকাশে। ভাবতে ভাবতে করুণাও কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন জানতে পারেননি।

সে রাত্রির অবসানে ঘুম ভাঙলো করুণাব। পূবের আকাশে আবাব সূর্য উঠল। কিন্তু সে দীপ্তি নেই আব সূর্যের চোখে। আব, আগের দেখা দীপ্তি তিনি খুঁজে পেলেন না হবিনারায়ণেব চোখে।

দশ ॥

সারারাত জেগে মনের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়া করেছিল অনুরূপা। বারেবারে অতনুর কথাই তার মনে পড়তে লাগল। ফিল্ম কোম্পানির অফিসের ঠিকানাটাও অরূপের হাতে পাঠিয়ে দিয়েছিল অতনু। অনেক রাতে বিছানা থেকে উঠে আলো জ্বেলে ঠিকানাটা আর একবার ভাল করে দেখেছিল অনুরূপা। শেষ পর্যন্ত অতনুর প্রস্তাবেই বুঝি রাজী হতে হবে।

সকাল হলে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করল অনুরূপা। মার কাছে শুনেছে সারা রাত খুব টাল গেছে বাবার। ডাক্তারবাবুও কাল আসেননি। আজ একবার তাঁকে নিয়ে আসা অত্যন্ত প্রয়োজন। অরূপের কথায় হয়ত আসবেন না। অনু নিজে যদি অনুরোধ জানায় তাহলে হয়ত আসতে পারেন। সে কথায় সম্মত হয় অনুরূপা। সাধারণ সাজগোজ করে সাধারণ একখানা শাড়ি পরে বেরিয়ে যায় সে। করুণা জানতে পারেন না শুধু ডাক্তারকে ডাকতেই সে বেরোয়নি, বেরিয়েছে ভাগ্য অন্বেষণে।

বর্ষণমুখর রাত্রির পর সূর্য উঠেছে। আবার রোদ উঠেছে ভিজে মাটির বুকে তপ্ততা আনবার জন্যে। শরতের সোনালি রোদ ঝকমক করছে। আগমনীর গানও হয়ত ভাসছে হালকা বাতাসে। কিন্তু অনুরূপার কাছে সে সবের কোন মূল্যই নেই। রৌদ্রের তাপে তপ্ত কাঞ্চনের মত রঙ ধরেছে তার মুখটা। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে তার কপালে আর কপোলে।

পথ চলতে চলতে অতনুর পাঠানো কাগজটা আর একবার দেখল অনুরূপা। ধর্মতলা অঞ্চলের একটা ঠিকানা। ঠিকানা খুঁজে যখন অনুরূপা হাজির হল যুগযাত্রী চিত্র প্রতিষ্ঠানের অফিসে তখন সাড়ে দশটা বেজে গেছে। ধর্মতলার পথে তখন ব্যস্ত মানুষের ভিড়। অফিস-যাত্রীদের সময়মত অফিসে পৌঁছে দেবার জন্যে ট্রাম আর বাসের দুরন্ত গতিতে আনাগোনা।

অফিসের বাইরে দারোয়ান বসে ছিল। তার কাছে একটা শ্লিপ দিয়ে বাইরেই অপেক্ষা করছিল অনুরূপা। একটু পরেই প্রায় ছুটতে ছুটতে আসে শতদল সেন। সে-ই হল ছবির পরিচালক। নমস্কার জানিয়ে লজ্জিতভাবে বলেঃ মাফ করবেন। কদিন ধরেই আপনার আশা করছিলাম। দারোয়ান বেটা এমন আহাম্মক আপনাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। আসুন, আসুন। ভেতরে আসুন।

জোর করে অনুরূপা স্মিত হাসি টেনে আনে মুখে। ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসে সে। পরিচালক শতদল সেন বলেঃ দেখুন, অতনুবাবুর কাছে আপনার কথা এত শুনেছি যে আপনার সঙ্গে যেন চেনা পরিচয় হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। আমার পরিচয়টা আগেই দিয়ে দিই। আমার নাম শতদল সেন। এঁদের নতুন ছবি 'নিঠুর দ্বন্দ্ব'র পরিচালনার ভার আমারই ওপরে।

নমস্কার জানায় অনুরূপা।

সামনে সেক্রেটারিয়েট টেবিলে বসেছিল রামলাল আর বজ্রপানি। তাদের সঙ্গেও অনুরূপার পরিচয় করিয়ে দিল শতদল।

ঃ রামলালজীর কথা আমি অতনুবাবুর কাছে শুনেছি।

নমস্কার বিনিময়ের পর অনুরূপা বললে।

রামলাল আর বজ্রপানি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে অনুরূপাকে। ছিদ্রান্বেষী পাত্রপক্ষকে পাত্রী দেখতে লক্ষ্য করেছে অনুরূপা। কিন্তু এ যেন আরও নির্লজ্জ আরও দৃষ্টিকটু।

বজ্রপানি পাইপে অগ্নিসংযোগ করে বললে: তুমি দেখে নিয়ো রামলাল অনুরূপা দেবী অল্পদিনেই একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী হয়ে উঠবে। অপরিচিত এক ভদ্রলোকের মুখে এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনে সঙ্কুচিত হয় অনুরূপা। শতদল হেসে বলে: আপনার কথাই যেন হয় বজ্রপানিবাবু।
টাইপরাইটার মেসিনে একজন মোসাহেব গোছের লোক বসে ছিল। কাজ করতে করতে সে বললে: নিশ্চয়ই হবে। মিস্টার সিন্‌হার মতো দূরদর্শী লোক আমি জীবনে দেখিনি। ওঁর কথা বেদবাক্য।

হো হো শব্দে হেসে ওঠে বজ্রপানি। তার হাসিটা খুব বিশ্রী লাগে অনুরূপার। এরকম পরিবেশের সঙ্গে সে পরিচিত নয়। নত চোখে মানুষগুলোকে সে দেখতে থাকে। তার চেনাশোনার গণ্ডীর ভেতরে যেন এদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। এদের যেন জাত আলাদা, জগৎ আলাদা। চটপটে বাকপটু মেয়েলি মেয়েলি শতদল সেন, হৃষ্টপুষ্ট তেলকধারী রামলাল গোয়েঙ্কা, কূটনৈতিক বজ্রপানি, বোকা বোকা চেহারার টাইপিস্ট সবাই এককভাবে সাধারণের বাইরে। ওদের যেমন কারও সঙ্গে কারও মিল নেই; তেমনি ওদের সঙ্গে মিল নেই অনুরূপার দেখা অন্য কোনও লোকের সঙ্গে।

অনুরূপা বসে ভাবে আর চেয়ে চেয়ে দেখে সারা ঘরখানা। ফার্নিচার, ঘড়ি, কার্পেট, আসবাবপত্র সবই সুন্দর। রুচির প্রলেপ সর্বত্র। শুধু দেওয়ালে টাঙানো কতকগুলো ছবি শালীনতার বেড়া পার হয়ে নির্লজ্জের মত তাকিয়ে আছে। সৌন্দর্যের দিক থেকে তারা রসোত্তীর্ণ। শিল্পীর হাতের নিপুণতায় তারা সার্থক সৃষ্টির মর্যাদা পেয়েছে। তবুও অনুরূপার কেমন অস্বস্তি লাগে সেগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখতে। বজ্রপানির ডাকে লজ্জিত হয়ে ফিরে তাকায় অনুরূপা।

বজ্রপানি বলে : কিছু বলুন।

অনুরূপা বলে : আমি কি বলব ? আপনারাই বলুন। আমি মতস্থির করে এসেছি আপনাদের ছবিতে অভিনয় করব। এখন পরীক্ষা করে নিয়োগ করবার কথা আপনাদের।

শতদল এগিয়ে এসে বলে : পরীক্ষার বিশেষ কিছু নেই। আপনার চেহারা, মুখ ছবিতে অদ্ভুত ভাল আসবে। নিখুঁত প্রোফাইল। আর, অভিনয় ? অতনুবাবুর কাছে শুনেছি অভিনয় আপনি ভালই করেন। তাছাড়া, ছবিতে অভিনয় করবার বিশেষ কিছু নেই। যেটুকু আছে আমরা শিখিয়ে নেব। স্টেজের সঙ্গে স্ক্রীণের এইখানেই তফাত।

: তাহলে আমি একরকম নির্বাচিত হলাম বলতে হবে ?

অনুরূপা কারো দিকে না তাকিয়েই যেন বললে কথাগুলো।

রামলাল খাতাপত্র দেখতে দেখতে বললে : ঠিক আছে। কাজ তবে পাকা করে ফেলো সিন্‌হা। আজই কনট্র্যাক্ট হয়ে যাক।

বজ্রপানি টাইপিস্টকে কনট্র্যাক্ট দলিলটা আনতে বলে। সেখানা হাতে নিয়ে শতদলের দিকে তাকিয়ে বলে : লেখাপড়াটা তাহলে হয়ে যাক, কি বলুন মিস্টার সেন ?

শতদল আর একবার অনুরূপার দিকে তাকিয়ে বলে : হ্যাঁ, কোন আপত্তি নেই। চরিত্রের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মিলেছে এঁর চেহারা। বাকি শুধু মাইক টেস্ট। গলার যা স্বর শুনছি আমার অভিজ্ঞতায় বলতে পারি মাইক টেস্টও দারুণ সাকসেস্‌ফুল হবে। কাল একবার মাইক টেস্ট করিয়ে কাল থেকেই রিহার্সাল শুরু করে দেব।

: কাল থেকেই ? অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করে অনুরূপা।

: কেন আপনার আপত্তি আছে ? বজ্রপানি জিজ্ঞাসা করে।

: না, মানে আপত্তি ? না। বাড়িতে মানে বাবার খুব অসুখ যাচ্ছে কিনা তাই—

কথার মাঝে তাকে থামিয়ে বজ্রপানি আর শতদল বলে ওঠে : বেশ

তো। এই কথা। তাহলে রিহার্সাল কদিন বাদেই শুরু করা যাবে। মানসিক উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা নিয়ে কোন কাজ ভাল হয় না। আপাততঃ আপনার সঙ্গে আমাদের এগ্রিমেণ্ট হয়ে থাকল। পরে আপনার সুবিধামত রিহার্সালের তারিখ জানাবেন।

ঃ আচ্ছা। প্রায় স্বগতোক্তির মতো বলে অনুরূপা।

বজ্রপানি পাইপটা ধরিয়ে এগ্রিমেণ্টটা পড়তে থাকে নিবিষ্ট মনে। একটু আধটু ভুলও সংশোধন করে সে ভুরু কুঁচকে। তারপর সেখানা বাড়িয়ে দেয় অনুরূপার কাছে।

ঃ ভাল করে পড়ে দেখুন। আপনি শিক্ষিতা। আপনাকে আর বুঝিয়ে দেবার কষ্ট করতে হবে না অবশ্য আপনার আপত্তি করবার মতো কোনো শর্তই রাখিনি এতে।

অনুরূপা পড়ে দেখল কাগজখানা। মাসিক পাঁচশো টাকার চুক্তিতে তিন বছরের মেয়াদে অভিনয় করবার শর্ত। এই প্রতিষ্ঠানের অনুমতি ব্যতিরেকে তিন বছরের মধ্যে অন্য কোথাও যোগদান করা যাবে না। শর্তে রাজি হয়ে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিল অনুরূপা। কাগজখানা ফিরিয়ে দিল সে বজ্রপানির হাতে। তাকে একটা কপি দেওয়া হলো।

বজ্রপানি সেখানা হাতে নিয়ে বললেঃ তাহলে এগ্রিমেণ্ট অনুযায়ী পাঁচশো টাকা আপনাকে অগ্রিম দেওয়া হচ্ছে।

এই কথা বলে টাইপিস্টকে ডাকে সে।

ঃ গদাধর বাবু।

গদাধর উঠে আসতে তাকে বলেঃ তাহলে একখানা পাঁচশো টাকার চেক—

ঃ চেক? হতাশভাবে তাকায় অনুরূপা।

পাইপে একটা টান দিয়ে বজ্রপানি বলেঃ ওহো! ক্যাশ হলেই বুঝি ভাল হয়? তার জন্যে ভাবনা নেই। হয়ে যাবে বোধ হয়।

রামলাল খাতা থেকে মুখ তুলে বলে : কী ভাবনা আছে ? নগদই দিচ্ছি।
ড্রয়ার খুলে পাঁচশো নগদ টাকা অনুরূপার হাতে দেয় রামলাল। ছোট ভ্যানিটি ব্যাগটায় টাকাটা না গুনেই রেখে দেয় অনুরূপা। বলে : নগদ টাকাটা পেয়ে বড় উপকার হল। তাছাড়া, আমি চেক নিয়ে কোথায় ঘুরব বলুন ! তারপর এদিক ওদিক চেয়ে বলে : আচ্ছা, অতনুবাবুকে দেখছি না। তিনি কোথায় গেলেন ?
: কাজে গেছে। আপনার যদি তাড়া না থাকে একটু বসলে দেখা হতে পারে। রামলাল মুখ না তুলে জবাব দেয়।
ঘড়ির দিকে চেয়ে অনুরূপা বলে : তাড়া আছে। আজ আর বসব না। আপনারা যদি অনুমতি করেন আমি এখন উঠি।
বজ্রপানি মুখ ফিরিয়ে বলে : দেখুন অনুরূপা দেবী, আরও দুএকটা কথা রয়েছে আপনার সঙ্গে। যদিও এর বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই, তবু আইন মানতে গেলে আপনাকে দুএকটা ডেক্লারেশন দিতে হবে। চিত্রজগতে প্রবেশ করতে গেলে সেগুলো দরকার। প্রথম কথা আপনি যে সাবালিকা সেটা আপনাকে স্বীকার করতে হবে। আর, অভিভাবকের একটা সম্মতি—
মুখে চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে অনুরূপার। তবুও যথাসম্ভব সহজ হয়ে বলে : প্রথমটা না হয় হল। কিন্তু দ্বিতীয়টা—। বাবাকে তো এই অবস্থায় বিরক্ত করা চলতে পারে না। তাছাড়া, নিজেকে যখন সাবালিকা বলে ঘোষণা করছি তখন—
: আচ্ছা, সে সব পরে হবে'খন। তার কিছু তাড়া নেই। আপনি আজ আসতে পারেন। আপনার সুবিধামতো খবর দেবেন।
অনুরূপা উঠে দাঁড়ায়। বজ্রপানি গদাধরকে বলে : গদাধরবাবু একটা ট্যাক্সি ডাকিয়ে দিন।
: ট্যাক্সি কি হবে ?

ঃ ট্যাক্সিতেই যাতায়াত করতে হবে। তা নইলে বদনাম হবে আপনার। এখন থেকে নিজেকে গোপন করবেন লোকের চোখ থেকে। তবেই সফল হবেন আপনি। জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ কেটে দেওয়া সবার আগে দরকার। বুঝলেন?

না বুঝেই হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনুরূপা।

শতদল প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে কাছে এসে বলে ঃ পরের দিন আলাপ করিয়ে দেব আমাদের হিরোর সঙ্গে। মেয়েদের মন কেড়ে নেওয়া চঞ্চল চৌধুরী। আজই সকালে এসেছিল সে।

ঃ ও! অতি কষ্টে বলে অনুরূপা।

দারোয়ান এসে জানায় গাড়ি এসে গেছে। সকলকে আবার নমস্কার জানিয়ে বিদায় নেয় অনুরূপা।

গদাধর নিজের জায়গায় বসে টাইপ করতে থাকে। অনুরূপা চলে যাওয়ার পব যথানিয়মে কপালে হাত ঠেকিয়ে রামলাল বলে ঃ জয় রাধাকিষণ! জয় রাধাকিষণ!

বজ্রপানি আপন মনেই যেন বলে ওঠে ঃ যাক, আসল ভাবনাটা থেকে রেহাই পাওয়া গেল। কী রকম মনে হচ্ছে শতদলবাবু?

শতদল মাথা চুলকে বলে পাবফেক্ট ক্যামেবা ফেস। কত যে হিডন্ বিউটি কলকাতায় ছড়িয়ে রয়েছে তার শেষ নেই। আজ পর্যন্ত কত মেযে এই রোলের জন্যে দেখেছি। অনুরূপার সঙ্গে তাদের কোন তুলনাই হয় না। অথচ দেখুন, এতদিন পচছিল কোন্ অন্ধ গলিতে।

ঃ পাঁকেই তো পদ্ম ফোটে। তাই তার আর এক নাম পঙ্কজ।

বেশ বিজ্ঞভাবেই পাইপে টান দিয়ে বজ্রপানি বলে। ধোঁওয়া ছেড়ে আবার শুরু করে ঃ অতনুব চোখ আছে বলতে হবে। আমাদের হিরোইন সত্যিই অপূর্ব।

নীরব সম্মতি জানিয়ে সায় দিল রামলাল আর শতদল সেন।

-॥ এগারো ॥---

ট্যাক্সিতে একা বসে অল্পক্ষণের পথে অনেক কথা ভেবেছে অনুরূপা। এই সংকট মুহূর্তে এতগুলো কাঁচা টাকা প্রচণ্ডতম অস্বস্তি তার মনে আনলেও তার প্রয়োজনটা সে অস্বীকার করতে পারে না। যেখানে বাঁচার দাবি সবার আগে সেখানে সংস্কারেব শাসন পরাহত। দিনযাপনের গ্লানিতে যেখানে সংকটাপন্ন প্রতিটি পল, সেখানে প্রাণধারণের যে কোনো উপায় মহামূল্য বয়ে আনে জীবনে। সেখানে মানুষ বোধ হয় দেখে না লাভ-ক্ষতির তুচ্ছ হিসাব, বোঝে না উপার্জনেব মূল্যায়ন। খরস্রোতা নদীর বুকে ভাসতে ভাসতে তৃণখণ্ডের অবলম্বনই অনেক আশার আলো জ্বালে ভাসমান মানুষের মনে। এমনি ধরনের অনেক অবাস্তর অসংলগ্ন কথা ভাবতে ভাবতে অনুরূপা দেখে বাড়িব কাছে এসে গেছে সে।

গলির মোড়ে নেমে খানিকটা হাঁটাপথে বাড়ি যেতে হয়। আচ্ছন্নের মত পথ চলছিল সে। সূর্যের প্রখর উত্তাপে ভরা ভাদ্রের তপ্ত বৌদ্র। আকাশের গায়ে তখন শরতের শুভ্র হালকা মেঘের লুকোচুরি। এমনি লুকোচুরিই তখন কত না কথার জাল বুনছিল অনুরূপার মনে। বুঝতে পারছিল না সে ভুল করেছে না ঠিক করেছে।

বেলা প্রায় দুটো বেজে গেছে। করুণা বোধ হয় বসে আছেন তার পথ চেয়ে। জানে না মা কি বলবে তাকে? সত্য মিথ্যায় মিশিয়ে কী কৈফিয়তই বা দেবে সে মায়ের কাছে। সেই কথা ভাবতে ভাবতে বাড়িতে ঢুকল অনুরূপা।

ওদিকে হরিনারায়ণের অবস্থা ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছে। আজ আর সকাল থেকে জলগ্রহণ করেন নি তিনি। অরূপকে কাছ-ছাড়া করেন নি সকাল থেকে। মাথার কাছে সে বসে আছে চুপ করে। আর, অনুরূপার ফিরতে দেরি দেখে করুণা একবার ঘর একবার সদর করছিলেন।

অনুরূপা সোজা বাবার ঘরে ঢোকে। তাকে দেখে অরূপ বলে : দিদি এসেছে বাবা।

কোনরকমে নিশ্বাস নিয়ে হরিনারায়ণ বলেন : এসেছিস। আয় মা, কাছে আয়। অনুরূপা বাবার কাছে গিয়ে বসে। বুকে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে সে। করুণা চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করেন : কোথায় গিয়েছিলি রে ? এত বেলা হলো ?

এর উত্তরে কি বলবে মনকে তখনও বুঝিয়ে উঠতে পারেনি। সে কথার কোন জবাব দিতে পারল না অনুরূপা। কী বলবে তা কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারছে না সে। থাক, পরে সুবিধেমতো বলা যাবে। কথাটার মোড় ঘুরিয়ে বাবাকে জিজ্ঞাসা করে অনুরূপা : তোমার শরীরটা কি আজ খুব খারাপ মনে হচ্ছে বাবা ?

খুব ক্লান্ত স্বরে হরিনারায়ণ জবাব দেন : না মা ! খারাপ মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে সব যন্ত্রণা আস্তে আস্তে জুড়িয়ে যাচ্ছে।

এ কথায় আতঙ্কিত হয় অরূপ। বিচলিত হয়ে ওঠে অনুরূপা। ধরা গলায় কাতর কণ্ঠে সে বলে ওঠে : বা-বা।

অনুরূপার একখানি হাত সস্নেহে ধরেন হরিনারাযণ। বলেন : দুঃখ করিস নে মা। এ ভাবে বেঁচে থেকে তোদের আর কত শাস্তি দেব বল ?

এতক্ষণে চোখ ফেটে জল আসে অনুরূপার। মনে ভাবে তার অসহায়তার অবসান হয়েছে। আপ্রাণ চেষ্টা করবে সে বাবাকে বাঁচিয়ে তুলতে। দয়ার দানের ওপর ভরসা করার দিন তাদের ফুরিয়েছে। খুব আত্ম-

ভাবে বাবার মুখের দিকে ঝুঁকে খানিক আগে পাওয়া পাঁচশো টাকা রাখল তাঁর হাতে। বললেঃ কিন্তু আমি যে টাকা এনেছি বাবা। টাকার অভাবে বিনা চিকিৎসায় আমি তোমাকে মরতে দেব না।

এতগুলো টাকা দেখে চমকে ওঠেন হরিনারায়ণ। করুণাও তখন সেখানে ছিলেন না। রান্নাঘরে গিয়েছিলেন। টাকা দেওয়ার পর বাবার মুখের চেহারা দেখে ভয় পেল অনুরূপা। 'এই ভীষণ পরিস্থিতি কেমন করে সামলানো যাবে এই চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠল সে। হরিনারায়ণের চোখদুটো চকচক করে ওঠে। সে চোখে বিস্ময়, ভয় আর দুরন্ত জিজ্ঞাসা।
ঃ একী! এ যে অনেক টাকা! কোথায় পেলি তুই?
বাবার উত্তেজনা দমন করবার চেষ্টা করে অনুরূপা। সান্ত্বনা দেয় তাঁকে। মনে মনে ভাবে বড় ভুল হল। বড় ভুল হয়ে গেল এই অসময়ে এমন ভাবে ধরা দেওয়া। কিন্তু ধরা না দিয়েও তো আর পারছিল না সে। কত যুদ্ধ করবে মনের সঙ্গে? আত্মপ্রবঞ্চনার সময় এ নয় আর সে শিক্ষাও তার নেই। তাই টাকাগুলো আগুনের লেলিহান শিখা হয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছিল তাকে। প্রতি মুহূর্তে সে নিষ্কৃতি চাইছিল সেই আগুন থেকে সেই দাহ থেকে।
বাবাকে বললে অনুরূপাঃ একটু সুস্থ হয়ে নাও বাবা। সে কথা পরে শুনো।
আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন হরিনারায়ণ। অসহিষ্ণু বালকের মতো চিৎকার করে ওঠেনঃ না-না। পরে শুনলে চলবে না। এই মুহূর্তেই আমাকে শুনতে হবে এ টাকা কোথায় পেলি?
ঃ নিজেকে কোন হীনতার মধ্যে ফেলে এ টাকা আনিনি! কোন দীনতাও এর জন্যে স্বীকার করিনি। আপাততঃ এইটুকুই শুধু শুনে রাখো বাবা।
নির্লিপ্ত হয়ে শান্তভাবে অনুরূপা জবাব দেয়।

ঃ আমাকে আরও শুনতে হবে। জানতে হবে কী মূল্য দিয়ে আমার অন্তিমকালে এতগুলো টাকা এল ?

আবেগে অনুরূপার হাত চেপে ধরেন হরিনারায়ণ।

রুদ্ধস্বরে অনুরূপা বলেঃ আমি—আমি ফিল্মে অভিনয় করব বাবা। চুক্তিপত্রে সই করে এ টাকাটা আগাম পেয়েছি।

থরথর করে কাঁপতে থাকে হরিনারায়ণের দেহটা। কথা তাঁর আটকে যায় উত্তেজনায়।

ঃ অভিনয়! ফিল্মে অভিনয়! তোমার ভাল লাগে তুমি ওপথে যেয়ো। কিন্তু এ টাকা আমি স্পর্শ করব না। আমার দিন ফুরিয়েছে। টাকার প্রয়োজনও ফুরিয়েছে। আমাকে তোরা নিষ্কৃতি দে। একটু শান্তিতে থাকতে দে আমাকে।

টাকাটা এক ঝটকায় দূরে ফেলে দিলেন তিনি। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মুখ ঢেকে অনুরূপা উঠে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে কাঁদতে কাঁদতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল সে।

একটু পরেই ওঘর থেকে করুণা চিৎকার শুনতে পেলেন। চিৎকার করছে অরূপ ঃ মা, মা, শিগ্‌গির এসো। বাবা কথা কইছে না।

ছুটে ঘরে আসে অনুরূপা। পিছনে আসেন করুণা। স্বামীকে দুহাত দিয়ে চেপে ধরেন করুণা। নিমীলিত নয়নে চিরশান্তির কোলে তখন আশ্রয় নিয়েছেন হরিনারায়ণ। তাঁর জীবনদীপ নিভে গেছে।

॥ বারো ॥

যুগযাত্রী চিত্র প্রতিষ্ঠানের ছবি শুরু করা বন্ধ রইল অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। অনুরূপাকে এ অবস্থায় কোন রকমেই বিরক্ত করা চলে না। এতে কোম্পানির কিছু লোকসান হবে। উপায় কী? নায়িকার কাজ বাদ দিয়ে ছবির অন্যান্য অংশের সুটিং চলতে থাকে অনিয়মিত ভাবে।

আজকাল আসর জমে রামলালের অফিসেই। সন্ধ্যাব পবে আলোচনা চলে আফিমের চোরা চালানের। সেখানে তখন উপস্থিত থাকে রামলাল, বজ্রপানি, অতনু আর কেনারাম। কেনারাম এখন রামলালের আর একজন প্রধান সহকারী। তার বয়স চল্লিশ ছাড়িয়ে গেছে। সংসারে তার আপন বলতে কেউ নেই। ছোটবেলায় বাপ মাকে হারিয়ে গুণ্ডাদের দলে মেশে। নানাবকম অপরাধমূলক কাজে কয়েকবার তার জেল হয়। বছব দশেক আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে কিছুদিন ভাল থাকে সে। কিন্তু তার রক্তে ছিল অপরাধ প্রবণতা। অল্পদিনের মধ্যেই একটা ডাকাতির মামলায় ধরা পড়ে। আদালতে তার বিচার হয়। তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। তবু তার বিগত ইতিহাস দেখে তাকে বাঙলা দেশ থেকে বহিষ্কারের আদেশ হয়। সেই থেকে সে থাকে সাহেবগঞ্জে।

রামলালের সঙ্গে তার পরিচয় করে দিয়েছিল অতনু। কেনারাম আন্তরাজ্য চোরাকারবারীদের একজন সর্দার। দুবছর আগে নাগপুরের কাছাকাছি রেলের ওয়াগন ভাঙতে গিয়ে গভীর রাত্রে তার ডান

হাতটাতে রেল পুলিসের গুলি লাগে। কোনরকমে প্রাণ বাঁচিয়ে সে পালিয়ে আসে। হাতটা শেষ পর্যন্ত বাদ দিতে হয়।

অতনু তাকে তখন একজন প্রাইভেট ডাক্তারের সাহায্যে সারিয়ে তুলে-ছিল। আর, রামলালের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। তাতে লাভই হয়েছে রামলালেব। অনেক খবর রাখে কেনারাম। অনেক টাকা সে পাইয়ে দিয়েছে তাকে।

পুলিসের চোখ এড়িয়ে কেনাবাম মাঝে মাঝে কলকাতায় আসে। রামলালকে প্রয়োজনীয় সংবাদ জানিয়ে গোপন পরামর্শ করে গোপনে আবার চলে যায়। সেদিনও সে এসেছিল সকালে। একটা মোটা টাকাব আফিমেব চালান আসছে দিল্লী থেকে। সে থাকবে সাহেবগঞ্জে। সেখান থেকে মাল নিয়ে তুলে দেবে অতনুব হাতে। গাড়িতে সেই মাল কলকাতায় নিয়ে আসবে অতনু। এই সব যুক্তি পবামর্শ করে চলে গেছে কেনাবাম।

সেই কথাই আলোচনা হচ্ছিল বামলাল আর বজ্রপানির মধ্যে। এমন সময়ে অতনু হাজিব হয়। তাদেব অভ্যর্থনা জানিয়ে বলে ঃ গুড-ইভনিং।

বজ্রপানি বলে ঃ এসো এসো, তোমার কথাই এতক্ষণ হচ্ছিল। ছিলে কোথায় ?

ঃ রেসের মাঠে। জানো না আজ শনিবার।

সে কথা শুনে বামলাল হেসে ওঠে। বজ্রপানি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করে ঃ আজ তোমার লাক্ কেমন অতনু ?

ঃ অত্যন্ত খারাপ। প্রায় হাজার টাকা বেরিয়ে গেল। মুখটা যথাসম্ভব বিকৃত করে অতনু জবাব দেয়।

আশ্চর্য হয়ে বজ্রপানি বলে ঃ আরে বলো কী হে !

একটা সিগারেট ধরিয়ে অতনু বলে ঃ বাদ দাও ওসব কথা। এখন কাজের কথা বলো।

রামলাল একমনে খাতাপত্র দেখছিল। খাতা বন্ধ করে সোজা হয়ে বসে সে। তারপর অতনুর দিকে তাকিয়ে বলে ঃ হ্যাঁ, কাজের কথাই হোক। দেখো অতনু, অনুরূপা তো আমাদের বেশ মুশকিলে ফেলে দিলে দেখছি। এক মাস কেটে গেল। আর কতদিন সবুর করব ?

অতনু চিন্তিতভাবে জবাব দেয় ঃ আমিও সেই কথা ভাবছিলাম। ওর মতলব কিছু বুঝতে পারছি না। যদি ভেবে থাকে পাঁচশো টাকা নিয়ে সরে পড়বে তাহলে ও খুব ভুল ভেবেছে। যাক, আর কটা দিন দেখি। তারপরে যা হয় ব্যবস্থা করব।

রামলাল জানে অতনুর পক্ষে কোনো কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া অসম্ভব নয়। সৌজন্যের কোনো বালাই নেই ওর কাছে। তাই তার কথা শুনে বলে ঃ ঠিক আছে। আরও কিছুদিন দেখা যাক।

গদাধর এতক্ষণ কয়েকটা চিঠিপত্র টাইপ করছিল। কাজ সেরে সেগুলো রামলালের টেবিলে রাখল সে। চিঠিগুলো হাতে নিয়ে রামলাল বললে ঃ তুমি যেতে পারো এখন।

গদাধর চলে যাওয়ার পর বজ্রপানি রামলালকে বলে ঃ অতনুর তো নেশার সময় হয়ে গেল। কেনারামের কথাটা এবারে ওকে বলো। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে একটু হেসে রামলাল আফিম চালানের সংবাদটা বললে।

সব শুনে অতনু জিজ্ঞাসা করল ঃ দিল্লী থেকে কবে রওনা হবে ওরা ?

ঃ আসছে মাসের তেরো তারিখে।

অতনু ক্যালেণ্ডারের পাতার দিকে চেয়ে ভাবতে থাকে। দুঃসাহসিক কোনো কাজের সন্ধান পেলে তার রক্তে আসে একটা কল্লোল। উত্তেজনায় চোখদুটো তার জ্বলতে থাকে। মাদকতা আসে তার দেহ-মনে। অতনুর দিকে একবার তাকিয়ে বজ্রপানি বলে ঃ খবরটা ভালোই। তবে আন্‌লাকী থার্টিন।

অতনু হো হো করে হেসে ওঠে সে কথায়। বলে : কিছু ভাবনা নেই তোমাদের। আন্‌লাকী থার্টিনকেই আমি লাকী করব।
রামলাল খুশি হয় সে কথা শুনে। এই রকম কথাই সে আশা করছিল অতনুর কাছে। টেবিল চাপড়ে বলে : বহুত আচ্ছা। এই তো তোমার যোগ্য কথা। রামলাল মানুষ চেনে।
: কিন্তু মানুষ রামলালকে চেনে না।
হো হো করে হেসে ওঠে সকলে। এই ছোট্ট কথাটা কোন্ দিক দিয়ে বলেছিল অতনু হাসির মাঝে হারিয়ে যায় তা। রামলাল হয়ত বুঝতে পারে না এর ভেতরে একটা ঘৃণা একটা বিদ্রূপ লুকিয়ে আছে। জানতে পারে না রামলালের পাপ-কলঙ্কিত ব্যক্তিজীবনের ওপর এক প্রচ্ছন্ন কটাক্ষের ইঙ্গিত সেই উক্তি।
বজ্রপানি বুঝেছিল অতনুব কথাটা কিন্তু কোন মূল্য দেয়নি তার।

ইদানীং কেনাবামেব সঙ্গে রামলালের ঘনিষ্ঠতা খুব বেড়ে উঠেছে। রামলাল তাকে বিশ্বাস করে খুব। হয়ত অতনুর চেয়েও বেশি বিশ্বাস কবে। এটা জানতে পেবেছে অতনু। তারই মাধ্যমে কেনারাম এসেছে তাদের দলে অথচ অল্পদিনে সে রামলালের এতো কাছাকাছি চলে এসেছে সে কথাটা ভাবতে খারাপ লাগে অতনুর। হয়ত সেই জন্যেই তার মনের মাঝে বাসা বেঁধেছে অভিমান আর রাগ। তারই প্রকাশ ওই ছোট্ট কথাটা। হতভাগ্য কেনারাম জানে না নেপথ্যে বসে থেকে লাভের বাবো আনা চাই রামলালের। জানে না রামলালের ভালবাসার কারণ।
কয়েকটা মিনিট তিনজনে বসেছিল চুপ করে। বন্ধ দরজার বাইরে টোকা মারার শব্দ হল। অপরিচিত গলায় কোনো এক ভদ্রলোক সাক্ষাৎ প্রার্থনা করছে। অতনু তখন উঠে দাঁড়ায়। ঘরের সংলগ্ন বাথরুম পেরিয়ে আর একটা ঘরে মালপত্র থাকে। সেখানে চলে গিয়ে

সাময়িকভাবে সে আত্মগোপন করে। কয়েকটি অপরাধমূলক কাজের জন্যে বেশ কিছুদিন তাকে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে।
বজ্রপানি উঠে এসে দরজা খুলে দেয়। মধ্যবয়সী একটি লোক নমস্কার জানিয়ে ঘরে ঢোকে। খুব ক্লান্তভাবে এসে নিজেই একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে রামলালের সামনে। একটু বোকা বোকা কথায় জিজ্ঞাসা করে ঃ এটাই তো যুগযাত্রী চিত্রপ্রতিষ্ঠানের অফিস ?
ঃ হ্যাঁ। বলুন, কি দরকার আপনার। আপনি কী লেখেন ? গান না গল্প ? বজ্রপানি জিজ্ঞাসা করে।
এই কথা বলে সন্ধানী দৃষ্টিতে বজ্রপানি চেয়ে থাকে সেই লোকটির দিকে। একটু ইতস্তত করে লোকটি বলে ঃ আমি লিখি না। লিখতে পারি না। এসেছি একটা খবরের জন্যে।
ঃ বলুন।
ঃ কেনারাম সরকার বলে কোন লোক আজ এসেছিল এই অফিসে ?

লোকটিকে প্রথম দেখেই সন্দেহ হয়েছিল বজ্রপানির। এখন তার মুখে কেনারামের নাম শুনে আর বুঝতে দেরি হল না যে এই অপরিচিত লোকটি গোয়েন্দা বিভাগের কোন তদন্তকারী অফিসার হওয়া বিচিত্র নয়। সেই ভেবে তার আপাদমস্তক দেখে অবাক চোখে বজ্রপানি বললে ঃ কেনারাম ? এ নাম তো জীবনে শুনিনি।
এই কথা শুনে লোকটি বললে ঃ কিন্তু আমি যতদূর শুনেছি ঠিক ওই রকম চেহারার এক ভদ্রলোক আজ সকালে আপনাদের এখানে এসেছিল। আমার আত্মীয় হয়। বিশেষ দরকার ছিল তার সঙ্গে।
একটা সিগারেট ধরিয়ে একটু ভেবে বজ্রপানি বললে ঃ সকালে একটি লোক এসেছিল বটে। তার নাম তো যতদূর মনে পড়ছে বেচারাম। সে লোকটি চাকরির সন্ধানে এসেছিল। আপনি চেহারার যা সাদৃশ্যের কথা বলছেন তা থাকতেও পারে। নামের সঙ্গেও যখন

কিছু মিল রয়েছে তখন তার ভাই-টাইও হতে পারে। কিন্তু তাকে তো আমরা ভাগিয়ে দিয়েছি। এই বাজারে চাকরি কোথায় পাব বলুন।

ঃ সে তো নিশ্চয়ই। তবে আমার খুব দরকার ছিল একটা সংবাদ জানার।

ঃ খুব দুঃখিত। হাত জোড় করে বজ্রপানি বললে।

ঃ আচ্ছা আসি। আপনাদের বিরক্ত করলাম।

উঠে দাঁড়িয়ে লোকটি বলে। বজ্রপানি বিনয়েব সঙ্গে জবাব দেয়

ঃ একশোবাব বিরক্ত কববেন। আমরা কিছু মনে করব না।

লোকটি চলে যায়।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে বজ্রপানি এসে বসে রামলালের সামনে। বলে ঃ সব কথা তো শুনলে। ব্যাপার খুব সুবিধের নয়। কেনারামের কলকাতায় আসা আব চলবে না। তাব সঙ্গে এখন থেকে লোক মারফতই যোগাযোগ করতে হবে।

ঃ হ্যাঁ। সেই ভাল। ওব পেছনে হুলিয়া রয়েছে। এখানে ওর আসার দবকার নেই।

এমন সময়ে অতনু বেবিয়ে এল। বজ্রপানির পিঠ চাপড়ে বললে ঃ চমৎকাব অভিনয় কবেছ বন্ধু।

মৃদু হাসে বজ্রপানি। অতনু প্রাইভেট চেম্বার থেকে একটা হুইস্কির বোতল নিয়ে এসেছিল। সেটা খুলে টেবিলেব ওপর রাখা জলের গ্লাসে খানিকটা ঢেলে এক চুমুকে খেয়ে নেয়।

বজ্রপানি অবাক হয়ে যায়। জল নিলে না, সোডা নিলে না। এ কি অদ্ভুত খাওয়া। অতনুর দিকে তাকিয়ে সে বলে ঃ তুমি কি পাগল হলে অতনু ?

মুখটা বিকৃত করে অতনু বলে ঃ পাগল আমাকে হতেই হবে। আমার সুরহারা জীবনে সুরাব যে কী প্রয়োজন তা তুমি বুঝবে না বন্ধু। তুমি

থাকো তোমার আইন আর আদালত নিয়ে, তুমি ভাবো তোমার মতলব আর মহাজনের কথা। আমাকে ভাবতে দাও আমার কথা।

আরও খানিকটা গলাধঃকরণ করে গ্লাসটা সজোরে টেবিলের ওপর রেখে দেয় অতনু।

আর কেউ কোনো কথা বলে না। বজ্রপানি নির্বাক হয়ে আর একটা সিগারেট ধরায়। অতনুর মনটা আজ খুব ভালো নেই। তাকে আর বিরক্ত না করাই শ্রেয়।

॥ তেরো ॥

হবিনারায়ণের মৃত্যুর পব প্রায় একমাস কেটে গেছে। একটা মানুষের অস্তিত্ব একটা সংসারের কাছে কতখানি তা শুধু বোঝা যায় তার অবর্তমানে। যখন সে থাকে সংসারের মাঝে তখন বোঝা যায় না কি নিদারুণ বেদনা মনে আনবে সেদ্দিন, যেদিন সে কথা বলবে না যেদিন সে আব থাকবে না।

একদিন তাব সব স্মৃতি হারিয়ে যাবে হয়ত কালেব গতিপথে। ঝাপসা হয়ে আসবে তাব ছবি। মন থেকে ধীরে ধীরে মুছে যাবে সব ছায়া। মন জুড়ে কতখানি তাব স্থান ছিল, সে কথা ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে আসবে একদিন ঠিকই। কিন্তু তবুও মানুষ মানতে পাবে না সেই চলে যাওয়াটা। কিছুতেই মনকে বাঁধতে পাবে না। কোন সান্ত্বনাই শান্ত করতে পারে না চলে যাওয়াব মুহূর্তটাকে। সে নেই, সে আর ডাকবে না, সে আব কথা বলবে না, এই কথা ভেবে অন্তরাত্মা কেঁদে ওঠে। প্রিয়জনের বিয়োগ-বেদনা গভীব হয়ে বাজে মনে।

করুণা আঘাত পেযেছিলেন প্রচণ্ড। অনুরূপা আর অরূপও কম আঘাত পায নি। অনেক কষ্টে নিজের মনকে বেঁধে অনুরূপা এনেছিল অনেক টাকা। সে টাকাব কোনো প্রয়োজন হয় নি। সে টাকা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন হরিনাবায়ণ। এই বাড়তি বেদনাটা অনুরূপাকে আরও ব্যথিত করেছিল।

আত্মীয় পরিজন স্বজন বন্ধু অনেকেই এসেছিল সেই অসময়ে। মামুলি শোক জানিয়ে চলে গেছে সবাই। এই একমাসের মধ্যে অতনুও

এসেছিল কয়েকবার। সাজানো কথায় সান্ত্বনার ভাষা সে শুনিয়ে গেছে করুণাকে। আর এসেছিল করুণার এক সম্পর্কের ভাই। নাম সনাতন। বয়স তার চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। কলকাতা থেকে বেশ কিছু দূরে পলাশডাঙা গ্রামের পোস্টমাস্টার সে। অনেকদিন আছে ওই একই পোস্ট অফিসে। সরল সাদাসিধে মানুষটি। মিতভাষী এবং নিরহঙ্কারী।

সনাতন করুণার ওপর রাগ করেছিল। বলেছিল: আমি না হয় কলকাতায় আসতে পারি না। চাকরির দায়িত্ব ছেড়ে আমার আসবার উপায়ও নেই। কিন্তু জামাইবাবুর এতো অসুখ গেল, একটা চিঠিও তো দিতে পারতে।

করুণা বলেছিলেন: ভেবেছিলাম তোমায় জানাব। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে সব শেষ হয়ে যাবে কেমন করে জানব।

সনাতন কয়েকদিন ছিল করুণার কাছে। সংসাবেব খরচপত্রও সে চালিয়েছিল। ভবিষ্যতের বিষয়ে যুক্তিপরামর্শও কবেছিল সে। ইতিমধ্যে ইন্‌সিওর কোম্পানির কাছে ধাব-বাকি বাদ দিয়ে কিছু টাকা পাওয়া যায়। আপাততঃ সেই টাকাটাই করুণার একমাত্র সম্বল। সনাতন বলেছিল, অরূপের পড়াশুনা বন্ধ করা মোটেই উচিত নয়। যেমন করে পারো ছেলেটাকে মানুষ করবার ব্যবস্থা কোরো।

এর জবাবে সেদিন কোন কথাই বলতে পাবেন নি করুণা। ভাবনা তাঁর অনুরূপাকে নিয়ে। সে কথাও হয়েছিল সনাতনের সঙ্গে। সনাতন বলেছিল, কলকাতার কোনো সরকারী অফিসে সে অনুরূপার জন্যে একটা চাকরির ব্যবস্থা কববে। দিনকাল খারাপ। প্রচণ্ড বেকার সমস্যা চারিদিকে। তবুও চেষ্টার কোন ত্রুটি করবে না সে। আশা করছে চার ছ' মাসের মধ্যে ব্যবস্থা একটা হবেই।

সনাতনের কথায় খানিকটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন করুণা। আজকাল কত মেয়েই তো চাকরি করছে। তাতে কোন লজ্জা নেই। ক্ষতি নেই

অনুরূপা যদি চাকরি করে। ভালই তো। যতদিন অরূপ মানুষ হয়ে টাকা আনতে না পারে চাকরি করুক না অনু। তাছাড়া এখন উপায়ই বা কী?

সনাতনের কথাগুলো অনুরূপাও ভেবেছে। কী কুক্ষণে সে গিয়েছিল যুগযাত্রী চিত্রপ্রতিষ্ঠানের অফিসে। তার মনেব অবস্থা মোটেই ভাল নয়। খবরের কাগজ দেখে ইদানীং সে তুএকটা চাকরির দরখাস্ত ছাড়ে। করুণা যদি তাতে খুশি হন সেই ভাল। সারাদিন বাড়িতে আর ভালও লাগে না তার। বাবাকে মনে পড়ে। অনেক জ্বালা অনেক বিরক্তি নিয়ে চলে গেছেন তিনি। সে তুঃখ রাখবার জায়গা নেই অনুরূপাব মনে। এই শোকের মাঝে তাকে আরও অস্থির করে তুলেছে তালুকদাব বাড়িওয়ালা। বাতাবাতি সে স্বার্থ ভুলে টাকা ভুলে বড় বেশি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছে অনুরূপার ওপর। সেটা যেমন দৃষ্টিকটু তেমনি ভয়েবও। তালুকদারেব চোখমুখগুলো কেমন যেন একটা কুৎসিত লালসামাখা। অনুরূপা কিছুতেই সহ্য করতে পাবে না ওই লোকটাকে।

একদিন সকালে দবজার কাছে দাঁড়িয়েছিল অনুরূপা। শরতের শেষে তখন হেমন্তের রুক্ষতা এক পা এক পা কবে এগিয়ে আসছে প্রকৃতির মাঝে। কখনও কখনও হিমেল হাওয়া আপন উত্তরীয় উড়িয়ে জানিয়ে দিচ্ছে শীতেব আর দেরি নেই। পৌষলক্ষ্মীব আবির্ভাব সমাগত। বাইরে পথের দিকে চেয়ে সকালের মিষ্টি বোদে দাঁড়িয়েছিল অনুরূপা। এমন সময়ে তালুকদার এসে হাজির হয়। স্বভাবসিদ্ধ হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলে: কেমন আছ মা?

অনুরূপা বলে: আমাকে সুস্থ শরীরে দেখেও হঠাৎ আপনার এ প্রশ্ন কেন?

তালুকদার কিন্তু এ কথায় কিছুই মনে করে না। হয়ত কথাটার মানেও

ভাল করে বুঝে উঠতে পারেনি সে। তবে এইটুকু বুঝেছে অনুরূপা অসন্তুষ্ট হয়েছে। তাই ভেবে তালুকদার বলে : তুমি দেখছি সব সময়ে চটেই আছ। পাশাপাশি থাকি। তোমরা আমার প্রজা। তোমাদের খবর সব সময়ে রেখেছি এবং এখনও রাখছি।

: কিন্তু বাবার অসুখের সময়ে কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করতে কোনদিন শুনেছি বলে মনে হয় না।

তালুকদার লজ্জিত হয় অনুরূপার কথায়। সত্যিই তো সে কোনদিন তাদের কুশল সংবাদ নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। বরং কথায় কথায় নালিশ করবার হুমকি দেখিয়েছে। কোর্টের রাস্তার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তাদের। লজ্জিতভাবে তালুকদার বলে : এ তুমি কি বলছ ? আমি সব সময়েই সংবাদ রাখতাম। প্রতিবেশী হিসেবে আমার একটা কর্তব্য আছে তো।

অনুরূপার রাগ হয় কর্তব্যের কথা শুনে। জানে না এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিল সেই কর্তব্যপরায়ণতা। টাকা ছাড়া যে লোক আর কিছুই বুঝতে চায়নি, দীর্ঘদিন ধরে তাদের দুরবস্থা জেনেও যে লোক সময়ে অসময়ে অকথা কুকথা বলতে একটুও লজ্জা পায়নি তার মুখে কর্তব্যের কথা শুনে হাসি পায় অনুরূপার। দুঃখও হয়। সে জানে আজ কিসের জন্যে কর্তব্যের বান ডেকেছে তালুকদারের মনে। কঠিন হয়ে অনুরূপা বলে : দেখুন, আপনার মুখে একথাটা শোভা পায় না।

তালুকদার একটু মুচকি হেসে বলে : তুমি আমাকে চিনলে না।

: আপনাকে চিনি বলেই একথা বললাম।

মাথা চুলকে তালুকদার বলে : পদবিটা আমার তালুকদার হয়েই যত গোলমাল। আচ্ছা, আজ তবে আসি।

অনুরূপার দিকে আর একবার তাকিয়ে তালুকদার চলে যায়। অনুরূপার ইচ্ছে করছিল খুব ভাল করে অপমান করে দেয় তাকে। পাছে মা রাগ করেন সেইজন্যে বেশি কিছু বলতে পারেনি সে। মনের

রাগ মনেই জমা থাকে। তালুকদারের এই নির্লজ্জ কথা, কথায় কথায় আলাপ জমাবার এই নির্লজ্জ চেষ্টা কার কাছে কেমন করে বলবে অনুরূপা। একটি প্রৌঢ় মানুষের মনে এ হেন বিকার দেখে ঘৃণায় শিউরে ওঠে সে। সমস্ত পুরুষজাতের ওপর ঘৃণা হয় তার। কেন এই লোভ, কেন এই জৈবিক আকর্ষণের নির্লজ্জ প্রকাশ, ভাবতে থাকে অনুরূপা। পৃথিবীটা এত ক্রুর, এত স্বার্থপর, এত নীচ এ জ্ঞান তার কয়েক বছর আগে ছিল না। যত দিন যাচ্ছে ততই নতুন করে জানছে পৃথিবীকে, নতুন করে দেখছে মানুষকে। তিক্ত সব অভিজ্ঞতায় ভরে উঠছে তার মনটা।

হরিনারায়ণ বেঁচে থাকতে আর একবার তালুকদার বলেছিল অনুরূপাকে তার ছোট মেয়েকে পড়াবার জন্যে। অনুরূপা জানত তালুকদারের ছোট মেয়ে বিকৃতমস্তিষ্ক। তাকে লেখাপড়া শেখানো প্রশ্নের বাইরে। এই প্রস্তাবের মধ্যে তালুকদারের কোন্ উদ্দেশ্য নিহিত ছিল সেটা তার জানতে একটুও দেরি হয়নি। সেইদিন থেকেই ভীষণ ঘৃণা জমে উঠেছিল তার মনে। কতখানি পশুত্ব লুকিয়েছিল তালুকদারের ভেতরে সবটা জানা হয়ে গিয়েছিল তার। কিন্তু উপায় কী? জগতে অনেক কথা অনেক অপ্রিয় মন্তব্য মুখ বুজেও সহ্য করতে হয়। নীরবে তালুকদারকেও সহ্য করেছিল অনুরূপা।

ক্রমে সবই অসহ্য হয়ে ওঠে। ওদিকে যুগযাত্রী চিত্র প্রতিষ্ঠান থেকে পর পর তিনবার ডাক এসেছে। অতনুও অধৈর্য হয়ে দুকথা শুনিয়ে দিয়ে গেছে একদিন। এদিকে করুণা ভালভাবে কথা বলেন না তার সঙ্গে। করুণা বোধহয় ভেবেছেন স্বামীর মৃত্যুটা অনেক এগিয়ে নিয়ে এসেছে অনুরূপা। মৃত্যু ছিল অবধারিত, মৃত্যু একদিন হতোই, কিন্তু অনুরূপার জন্যে তা ত্বরান্বিত হয়েছে। শেষ মুহূর্তে অনেক ক্ষোভ আর

বেদনা নিয়ে চলে গেছেন তিনি। সেইকথা ভেবেই হয়তো করুণা আর আগের চোখে দেখেন না অনুরূপাকে। কেমন যেন দূরে সরে গেছেন এই অল্পদিনের মধ্যে। এইসব ভাবনা বেশ খানিকটা পঙ্গু করে দিয়েছিল অনুরূপাকে। অনেক সংশয় আর দ্বন্দ্ব এনেছিল তার মনে। নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী বলে মনে হচ্ছিল ক্ষণে ক্ষণে।

দ্বিধার দোলায় দুলে কয়েকটা দিন কেটে যাবার পর একদিন সন্ধ্যায় আবার অতনু আসে। তার চোখ দুটো তখন রক্তাভ। ঘর্মাক্ত দেহে পথ পরিক্রমার ক্লান্তি। তাকে দেখে বিস্মিত হয়ে অনুরূপা ঘরে ডেকে নিয়ে যায়। বলে : আপনি এমন অসময়ে হঠাৎ যে—

: আমার কোন কিছু হঠাৎ ছাড়া হয় না। অসময়ই আমার সময়। চেয়ারটা টেনে বসে অতনু। অস্থিরতা তার মনে। কিছু একটা বলবে বলে মনে হয়। তাকে বসিয়ে রেখে অনুরূপা চা আনতে চলে যায়। ক্লান্ত মানুষটার একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। তারপর ধীরে-সুস্থে তার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা যাবে। কারণ, যুগযাত্রী চিত্র প্রতিষ্ঠান থেকে কয়েকবার ডেকে পাঠিয়েছে অনুরূপাকে। সে বিষয়ে অতনুর সঙ্গে কিছু পরামর্শ করা দরকার। চা তৈরি করতে করতে এইসব কথা ভেবেছিল অনুরূপা। চা নিয়ে আবার ঘরে ঢোকে সে। হাত পাখাটা দিয়ে অতনু তখন হাওয়া খাচ্ছে। অনুরূপা কাছে এসে একটা মোড়ার ওপর বসে বলে : আপনাকে কিন্তু আমি খুব আশা করছিলাম।

অতনু চায়ে চুমুক দিয়ে বলে : তা করতে পারো। কিন্তু তোমারও তো কোন খোঁজখবর পাই না।

শান্তভাবে শাড়ির আঁচলটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে অনুরূপা বলে : নিখোঁজ আমি হইনি। খবর নিতে এলে খবর পেতেন বৈকি।

অতনু নিজে কয়েকটা ব্যাপারে ব্যস্ত ছিল। রামলালের কাছেও কয়েকদিন যেতে পারেনি। রামলালকে সে কথা দিয়েছিল অনুরূপার সঙ্গে দেখা করে তার মতিগতি সে জানাবে। তবু সময়মতো দেখা করতে পারেনি। আজ হঠাৎ তার মনে পড়ে গেছে। রাস্তা চলতে চলতে রাগও হয়েছে অনুরূপার ওপর। একবার সে যুগযাত্রীর অফিসে গিয়ে দেখা করে এলে অতনুকে আর কোন কথা শুনতে হতো না। সেটা অনুরূপার পক্ষে এমন কিছু অসম্ভব ছিল না। আইনসঙ্গত চুক্তির শর্ত যেখানে, সেখানে শোক বা গর্ব বেশিদিন চলে না। রুমাল দিয়ে মুখটা মুছতে মুছতে অতনু বললে : সেকথা বলছি না। বলছি, যা হবার হয়ে গেছে। বাবা কারও চিরদিন থাকে না। শোক পাওয়াও খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না।

অনুরূপার রাগ হয় কথাগুলো শুনে। মনে মনে হয়ত বোঝে অতনু অপ্রকৃতিস্থ। অতনুর প্রতি তার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। তবু সৌজন্য আশা করেছিল সে। যে দিন সকালে অতনুর সঙ্গে আকস্মিকভাবে তাদের বাড়িতে দেখা হয়ে যায়, যেদিন সে জানতে পারে দেশের কাজ করতে নেমে পুলিসের ভয়ে আত্মগোপন করেছে অতনু, সেইদিন থেকেই কেমন একটা সন্দেহ উঁকি দিয়েছিল অনুরূপার মনে। ধনীর ছেলে অতনু চিত্তবিনোদনের জন্যে হোটেল গ্রীনএ আসবে সেটা এমন কিছু আশ্চর্যের কথা নয়। তবু অতনুর সব মিলিয়ে সে একটা জিজ্ঞাসা। কোথায় সে থাকে, কী তার আসল পেশা, সব কথাই কৌশলে গোপন করেছে সে অনুরূপার কাছে। মাঝে মাঝে অনুরূপা কৌতূহলী হয়েছে। কিন্তু মুখ ফুটে কোনো কথা কোনদিন বলেনি সে। বলবার দরকারই বা কী? অতনু তার কে? অনুরূপা তার সঙ্গে কথা বলেছে সৌজন্যের খাতিরে আর প্রয়োজনবোধে। আজ যদি অতনুর সঙ্গে সব সম্পর্ক

ছিন্ন হয়ে যায় তাতে অনুরূপার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। সাগরে যাদের শয্যা, শিশিরে তাদের ভয় কিসের ?
অনুরূপা বলে : সামান্য উপদেশটুকু দেবার জন্যে আপনার কষ্ট করে না এলেও চলত।
অতনু এবার উত্তেজিত হয়ে ওঠে। দিনের পর দিন এইরকম কথা কাটাকাটি আর ভাল লাগে না। অতনু চিরদিনই এক কথার মানুষ। কথার জাল বুনতে সে পারে। সে শিক্ষা বা যোগ্যতা তার কাছে। কিন্তু স্বপ্নবিলাসের সে পর্ব শেষ হয়ে গেছে তার জীবন থেকে। সব কিছুতে অসংযমী হয়েও কথা বলায় সে সংযমী। অনুরূপার কথার উত্তরে অতনু বললে : তোমাকে উপদেশ দিতে আসিনি অনু। উপকার করতে গিয়ে নিজে পদে পদে অপদস্থ হচ্ছি। তাই আমার আসা।
: আসল বক্তব্যটা বলুন এবার।
: কোম্পানি আর কতদিন বসে বসে লোকসান খাবে ? তুমি রিহার্সাল অ্যাটেণ্ড করছ না। সুটিং এর জন্যে আউটডোরে যেতেও আর দেরী নেই। একটা খবর পর্যন্ত দিচ্ছ না—ব্যাপার কী বলো ত ?
: ব্যাপার কিছুই নয়। ভাবছি কি করব। খুব শান্তভাবে অনুরূপা জবাব দেয়। অতনু কোন কথা বলে না। বলবার কিছু নেই তার। অনুরূপার একথার কোন উত্তর দেওয়া যায় না। সে বুঝতে পারছে না আইন এখন রামলালের দিকে। আর অতনুও দালালির অঙ্কটা ছেড়ে দেবে না। এতটা লোকসান সহ্য করবে না সে। অনুরূপাকে ভয় দেখিয়ে পথে আনা ছাড়া কোন উপায় খুঁজে পায় না অতনু। কী বলা যায় সেই কথাই ভাবে সে।

অনুরূপার তখন মনে পড়ে বাবার মৃত্যুর আগের দৃশ্যটা। যে টাকা বৃদ্ধ স্পর্শ করেন নি, সে টাকা আজ কোন্ শান্তি আনবে তাদের

সংসারে ? টাকার প্রতি অনুরূপার মোহ নেই আকর্ষণ নেই, নেই কোন ভালবাসা। নিজের জন্যে সে ভাবে না। অর্ধাশনে অনশনে মরে গেলেও ক্ষতি নেই কোনো। এই সব ভেবে অনুরূপা বলে ঃ জানেন তো, বাবা আমার টাকা স্পর্শ করলেন না। অভিমান করে চলে গেলেন হয়ত বা আমাকে অভিশাপ দিয়ে। মায়ের মনও সেইজন্যে খুব খারাপ।

অতনু সে সব কথার কোন মূল্য দেয় না। অন্যদিকে চেয়ে সে একটা সিগারেট ধরায়। বলে ঃ এখন আর সে কথা ভেবে কোন লাভ নেই অনু। যা কিছু ভাববার তা চুক্তিপত্রে সই করার আগেই তোমার ভাবা উচিত ছিল।

আহত হয়ে অনুরূপা বলে ওঠে ঃ আমার উপার্জনের টাকা সংসার প্রত্যাখ্যান করলেও—

ঃ করলেও এখন আর পেছিয়ে যাবার কোন উপায় নেই।

অতনুব গলার স্বরটা অদ্ভুত রকমের শোনাচ্ছিল অনুরূপার কাছে। এতদিনের যে দরদ যে আন্তরিকতা সে শুনেছে তার কাছে তা যতই মেকী হোক, তার ভেতরে ছিল একটা সুর একটা সাবলীল ছন্দ। কিন্তু আজকের কথাগুলো যেন অন্যরকম। সে কথার মধ্যে সুর নেই প্রাণ নেই। শাসন করবার একটা প্রচ্ছন্ন মনোবৃত্তি যেন লুকিয়ে আছে সেখানে। অনুরূপা চিন্তিত মুখে বলে ঃ দেখুন অতনুবাবু, আমার মায়ের মন আমি যেটুকু বুঝতে পারছি তাতে মনে হয় অভিনয় করাটা তিনি ভাল মনে নেবেন না। তাঁর মতে এতে তাঁর সম্মান নষ্ট হবে। তাই, আমি বলছিলাম সেই তথাকথিত সম্মান যাতে বজায় থাকে সেই রকম কোনো চাকরি—

তাকে থামিয়ে অতনু অধৈর্য হয়ে বলে ওঠে ঃ সে প্রশ্নই ওঠে না আর। তোমাদের সম্মান কি এতই ঠুনকো যে এত সহজেই তা ভেঙে যাবে

কাঁচের মতো ? তুমি কি মনে করো অন্য কোন চাকরি করলেও হাজার লোকের দৃষ্টির বাণ বিঁধবে না তোমাকে ?
ঃ আমি যে কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারছি না নিজের পথ।

পথ হারিয়ে ফেলেছিল অনুরূপা সত্যিই। অতনুও চাইছিল না কোন বড় রকমের আঘাত দিতে। প্রথমে সে তাকে বোঝাতেই চেষ্টা করল। শেষকালে চরম ব্যবস্থা প্রয়োজন হলে নিতে হবে। অতনু খুব ধীরে ধীরে বললেঃ নিজের পথ তুমি ঠিকই বেছে নিয়েছ। ভুল পথ ধরোনি। পথে কাদা থাকে কিন্তু কাদা বাঁচিয়ে পথ চলাই হল বিচক্ষণতা। আমি বুঝতে পারছি তোমাদের সংসারের ভেতরে পুরানো দিনের রক্ষণশীলতার বীজ শেকড় গেড়ে বসে আছে আজও। সংস্কারকে কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে তাও জানি। তবু নিজের হিসেবেই নিজের ভালমন্দ ঠিক করে ফেলতে হবে।
অতনুর কথাগুলো খুব খারাপ লাগেনি অনুরূপার। তাই সে একটু ভেবে বললেঃ সংস্কারকে কাটিয়ে উঠতে আমি হয়ত পারব কিন্তু আমার মা আমার ভাই—
ঃ তোমার ভাই এমন কিছু রোজগার করতে পারবে না যাতে সংসার সচল হবে। আর আজ না হোক দুদিন পরে মনের দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠতে পারবেন তোমার মা।
অনুরূপা চুপ করেই বসে থাকে। অতনু আবার বলেঃ তাছাড়া ছেলেমানুষি করাটা আর ভাল দেখায় না। ভুলে যেয়ো না কোম্পানি এখন তোমাকে আইনে বেঁধে ফেলেছে। সে বাঁধন ছেঁড়া তোমার পক্ষে অসাধ্য। যদি বা বাঁধন ছেঁড়ো, তাহলে কোম্পানি তোমাকে ছেড়ে দেবে না। একটা মোটা টাকার ক্ষতিপূরণ দাবি করবে। আর সেদিন তোমার এই খামখেয়ালির জবাব দিতে হবে প্রকাশ্য আদালতে।

চিন্তায় ভরে যায় অনুরূপার মুখখানা। যাবার সময়ে অতনু বলে যায় ঃ আজ তাহলে উঠি। কথাগুলো মনে থাকে যেন।

কতক্ষণ অনুরূপা সেইভাবে বসেছিল জানে না। যখন তার চমক ভাঙলো তখন বেশ রাত হয়ে গেছে।

অসহনীয় দুঃখের মধ্যে জয়ার দিন কাটে গতানুগতিক ভাবে। যেদিন রাত্রে অতনু এসেছিল আর জয়া তাকে থাকতে বলেছিল সেদিন প্রত্যাখ্যাত হয়ে তার মনটা একেবারে ভেঙে গিয়েছিল। মনের আকাশে সেদিন ভেসে উঠেছিল হারানো দিনেব অনেক ছবি। নির্জন ঘরে সারারাত সে কেঁদেছিল আর স্মৃতির রোমন্থন করেছিল।

জয়ার বাবা ছিলেন অজিতপ্রসাদের বাল্যবন্ধু। ছোটবেলায় বাবাব সঙ্গে এ বাড়িতে অনেকবার এসেছে। তখন জানতে পারেনি যৌবনে এই প্রাসাদেই কাটবে তার নির্বাসিত জীবন। জানতে পারেনি মোগল হারেমে বন্দিনী খেয়ালী নবাবেব অবহেলিতা বেগমের মতোই একদিন তাকে তিলে তিলে ক্ষয় হতে হবে এখানে।

কৈশোরে সে বাপ-মাকে হারায়। তারপর মামার আশ্রয়ে থেকে বড় হয়। স্কুলেব পড়া শেষ করে কলেজে ঢোকে। অতনুর সঙ্গে কোন্ অশুভ মুহূর্তে ঘনিষ্ঠতা হয়। তখন অতনু ছিল অন্য মানুষ। মাত্র তিন বছর আগের কথা। একটু খামখেয়ালী ছিল সে বরাবরই কিন্তু এমন ছন্নছাড়া ছিল না।

তাদের দুজনের ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য কবে অজিতপ্রসাদ একদিন তার মামার কাছে প্রস্তাব করলেন। মামা খুব আনন্দিত হয়েছিলেন। অজিতপ্রসাদ বন্ধুত্বের নিগড় পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপন করে নতুন করে বাঁধতে চেয়েছিলেন এতে খুশি হবারই কথা। অলক্ষ্যে বিধাতা সেদিন হেসেছিলেন।

তারপর এই সামান্য সময়ে কেমন করে কি ঘটে গেল তা ভাবলে অবাক হতে হয়। রেসের মাঠে অতনু উড়িয়ে দিতে থাকে টাকা। টাকায় টান পড়ে। টান পড়ে তখন জয়ার গায়ের গয়নায়। অতনুর নজর পড়ে অজিতপ্রসাদের সিন্ধুকে। বাপ আর ছেলের মাঝে শুরু হয় বচসা, তর্ক। শেষ পর্যন্ত কলহ। দিনের পর দিন বদলে যায় অতনু। প্রেম দিয়ে মায়া দিয়ে যৌবন দিয়েও জয়া আর ধরে রাখতে পারে না তাকে।

জয়া কিন্তু আশা করে অতনু একদিন ফিরে আসবে। ফিরে আসবে তার ভুল বুঝে। অসংযমেও মানুষের ক্লান্তি আসে। অতনুরও ক্লান্তি আসবে। তাই পথ চেয়ে থাকে জয়া।

যে রাত্রে অতনু জয়ার গয়না নিয়ে চলে যায় সে রাত্রে একটুও ঘুমোতে পারেনি জয়া। তারপর দুএকদিন অতনু এসেছে। অল্পক্ষণ পরেই আবার চলে গেছে। বাবার সঙ্গে দেখা করেনি। এবারে অনেকদিন আসেনি সে। অতনুকে মনে পড়ে জয়ার।

অজিতপ্রসাদেরও মনে পড়ে তাকে। কিন্তু ঘৃণায় ভরে যায় তাঁর মনটা। ইদানীং অজিতপ্রসাদ কেমন যেন হয়ে গেছেন। খেতে চান না কিছুই। আপন মনে কি যেন বলেন সারাক্ষণ। পরিচিত অপরিচিত লোক কেউ এলে অনাবশ্যক আলোচনা করতে থাকেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

কখনও স্থির চোখে চেয়ে থাকেন পূর্বপুরুষদের বিরাট ছবিগুলোর দিকে। কখনও কথা বলেন স্ত্রীর ছবিখানার সামনে দাঁড়িয়ে। এসব দেখে ভয় লাগে জয়ার। শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা কে জানে। জয়া ভাবে, অতনুকে এসব কথা জানানো দরকার। কিন্তু কোথায় অতনু ? কেমন করেই বা সে তার সন্ধান পাবে ?

একদিন ডাক্তার দীনদয়াল এসেছিলেন। এ বাড়ির পুরানো ডাক্তার তিনি। তাঁর কাছে অজিতপ্রসাদ অনেকক্ষণ ধরে বলছিলেন পরিবারের

ইতিহাস। এ পরিবারের অনেক কথাই জানতেন দীনদয়াল। বৃদ্ধের মুখে তার পুনরাবৃত্তি ভাল লাগছিল না। তবুও শুনতে হচ্ছিল তাঁকে।

দীনদয়াল যখন উঠলেন তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। জয়াকে ডেকে একান্তে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এরকম অবস্থা কবে থেকে লক্ষ্য করছ ?

ঃ প্রায় এক সপ্তাহ হবে। কয়েকদিন ধরে খেতেও চাইছেন না।

ডাক্তার দীনদয়াল কপালটা কুঁচকে একটু দাঁড়ালেন। তারপর বললেন ঃ পুয়োর ওল্ড ম্যান ! ছিল ইনসোমানিয়া। এখন দেখছি লুনেসির দিকে টার্ন নিচ্ছে।

সেকথা শুনে মুখটা শুকিয়ে যায় জয়ার। ছোটবেলায় বাবাকে হারিয়েছিল সে। অজিতপ্রসাদের কাছ থেকে আবার নতুন করে পেয়েছিল যে স্নেহ আর ভালবাসা, তা পিতৃস্নেহের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। অজিতপ্রসাদ ছিলেন জ্ঞানী বৃদ্ধ আর তাঁর মনটায় ছিল শিশুর সারল্য। তাঁকে সেবা করে, যত্ন করে অনেক বেদনা ভুলে জয়ার দিন কাটছিল। কিন্তু আজ সেই বৃদ্ধ যদি ছিটকে পড়েন স্বাভাবিক প্রকৃতিস্থ জীবন থেকে, মাথার বিকৃতি যদি ঘটে তাঁর, তাহলে কোথায় দাঁড়াবে জয়া, কাকে অবলম্বন করে দিন কাটাবে ? এতদিন সুখে দুঃখে আনন্দে বেদনায় ওই বৃদ্ধই ছিলেন তার সাথী সঙ্গী দরদী হিতাকাঙ্ক্ষী। রিক্ত নিঃস্ব জমিদারের মনে ছিল অনেক ঐশ্বর্যের সম্ভার। কিন্তু যেদিন তাঁর দৃষ্টিতে আসবে শূন্যতা, যেদিন পার্থিব জগতের সব সুখ দুঃখকে তিনি ভুলে যাবেন, যেদিন আপন মনে আপন খেয়ালে তিনি হাসবেন আর কাঁদবেন, সেদিন কোন্ শান্তি তিনি নিজে পাবেন জয়া জানে না। কিন্তু এটুকু জানে, জয়ার নিজের বেঁচে থাকাটা সেদিন হবে ব্যর্থ। সেই কথা ভেবে আতঙ্কে জয়ার চোখ দুটো অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। ঝড়ে ভেঙে যাওয়া কুলায় দেখে আকাশ বিহঙ্গীর চোখে যে নিরাশা ফোটে ঠিক তেমনি।

ডাক্তার দীনদয়াল সেটা লক্ষ্য করেছিলেন। বললেন: এখনও অবশ্য সঠিক কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তবে এইরকম একটা পেশেণ্ট দেখেছিলাম। তারপর হঠাৎ তার মেমারি ফেল করল। বয়সও প্রায় এইরকম। আমি ভাবছি তেমন কোন অবস্থা না হয়।
জয়া বললে: আপনিই ভরসা ডাক্তারবাবু।
: ভরসা নিশ্চয়ই করবে। আমার যথাসাধ্য আমি চেষ্টা করছি। এখন কয়েকদিন ওষুধ খান আর আমি অবজারভেশনে রাখি। কোনো উন্নতি যদি না দেখি তাহলে সাইকো-থেরাপিস্ট ডাক্তার বটব্যালকে একদিন নিয়ে আসব।

দীনদয়াল চলে গেলেন। জয়া ভাবে আবার কোন্ খেলা শুরু হল তাকে নিয়ে। ঠিক সেই সময়ে এল সে বাড়ির পুরানো ঝি, চাকর আর ঠাকুর। এসে হাজির হল এক সঙ্গে। সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে তারা। হাসি মুখে জয়া জিজ্ঞাসা করে: কী চাই রে তোদের? নিশ্চয়ই আমি কোন অন্যায় করেছি?
জিভ কেটে প্রণাম জানাল তারা। বললে: কর্তাবাবু তাদের দেখলেই ভয়ানক চটে যাচ্ছেন। তেড়ে মারতে আসছেন তাদের। এই অবস্থায় তাদের পক্ষে কাজ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। জয়াকে তারা সাক্ষাত লক্ষ্মী-প্রতিমা বলে জানে ও মানে।
জয়া সব কথা শুনে তাদের বুঝিয়ে বলে: বাবাকে তোরা তো জানিস। কী মানুষ আজ কী হয়ে গেছেন। একটু চুপ করে সহ্য কর। আমি বুঝিয়ে বলব তাঁকে। তোরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, বাবা যেন আবার সেরে ওঠেন।
সবাই ফিরে যায় সেই কথা শুনে।
একখানা বই হাতে নিয়ে খাটের ওপর শুয়ে পড়ে জয়া। খানিকক্ষণ পড়ার পর আর ভাল লাগে না উঠে রেডিওটা খুলে দেয়। ধর্মমূলক

একটা গান হচ্ছিল তখন। মোহিত হয়ে গান শুনতে থাকে সে। তারপর হঠাৎ চিৎকার শোনে। অজিতপ্রসাদ চিৎকার করছেন: বেরিয়ে যাও বেরিয়ে যাও, আমার বাড়ি থেকে। ছুটে যায় জয়া। দেখে কেউ কোথাও নেই। একখানা ছবিব দিকে তাকিয়ে অজিতপ্রসাদ চিৎকার করছেন। ঘোড়ার ওপর চড়া অতনুব ছেলেবেলাকার একটা ছবি।

কোন কথা না বলে জয়া নিঃশব্দে ফিবে আসে নিজের ঘরে। অতি পুরাতন সেই ঘড়িটায় তখন এগারোটা বাজার ক্লান্ত হলো শব্দ।

॥ পনেরো ॥

চিন্তার জাল বুনে অনুরূপার কেটে যায় দুটি মাস। অতনু আর আসেনি অরূপের পড়াশুনাও বন্ধ। অনুরূপার একটুও ভাল লাগে না। নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসে তার। করুণা ভালভাবে কথা বলেন না তার সঙ্গে। করুণার ধারণা মেয়ের কাছে আঘাত পাওয়ার দরুন তাঁর স্বামী এত শীঘ্র মারা গেলেন। নইলে হয়ত আরও কিছুদিন বাঁচতেন।

মায়ের মনের অবস্থা দেখে বার বার অনুরূপার নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়। সে জ্বালার বাইরেও আছে আরও অনেক জ্বালা। অতনু শেষ দিনে যেসব কথা শুনিয়ে গেছে সেগুলো ভাববার মতো। সত্যিই তো। অসময়ে পাঁচশো নগদ টাকা তারা দিয়েছে একটা চুক্তির ওপর নির্ভর করে। সে চুক্তি ভাঙলে বিশ্বাস ভঙ্গ হবে। তার পরিণতি যে কী সেকথাও জানিয়ে দিয়ে গেছে অতনু।

খবরের কাগজে কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে অনেক দরখাস্ত দিয়েছিল অনুরূপা। জবাব এসেছে দুএকটির মাত্র। সেখানে ইনটারভিউ দিয়েছিল অনুরূপা। নিয়োগপত্র কেবল এক জায়গা থেকেই পেয়েছিল। সমাজ সেবার কাজে গ্রামে গ্রামে প্রচার চালাতে হবে। সে চাকরি নেওয়ায় যথেষ্ট অসুবিধা থাকায় বেকার বসে থাকতে হল তাকে।

ওদিকে সনাতনের কাছ থেকেও আর কোন সংবাদ নেই। ইন্‌সিওর কোম্পানি থেকে পাওয়া টাকা ভেঙে ভেঙে চলতে লাগল সংসার-খরচ। এমনিভাবে কয়েকদিন কেটে যাবার পর যুগযাত্রী চিত্র প্রতিষ্ঠান

থেকে চিঠি এল। চিঠির ভাষা পড়ে ভাবনায় পড়ল অনুরূপা। মনে মনে ঠিক করে সে, ছবিতে অভিনয়ই করবে। আজও যখন কোন চাকরি পাওয়া গেল না তখন উপায় কী? ভেবেছিল কোথাও কোনো কাজ পেলে যেমন করে হোক পাঁচশো টাকা সংগ্রহ করে রামলালের পায়ে ধরে নিষ্কৃতি চাইবে। কিন্তু সে আশা তার পূর্ণ হল না।

এক গুরুতর সমস্যায় পড়েছিল অনুরূপা। একদিকে এই উপবাসী সংসার আর একদিকে যুগযাত্রী চিত্র প্রতিষ্ঠান। এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে চোখ ফেটে তার জল এল। মনে মনে স্থির করল অভিনয়ই করবে সে। বাবার ছবিখানার দিকে এগিয়ে যায় সে। আপন মনে সেখানার দিকে চেয়ে বলে: বাবা, আমাকে তুমি ক্ষমা করো।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। করুণা ধুনো নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন তার পিছনে। বিরক্ত হয়ে বলেন: খুব হয়েছে। ওঁর নাম করে ক্ষমা চেয়ে আত্মার অশান্তি ঘটাস্‌নি।

মায়ের কথা শুনে খুব আঘাত পেয়েছিল অনুরূপা। করুণা কিছুতেই তার অপরাধ ক্ষমার চোখে দেখতে পারছেন না। একবারও বুঝতে চাইছেন না কোন্‌ সঙ্কট মুহূর্তে সে এনেছিল অতগুলো টাকা। সেখানে নিজের ভোগের কোন প্রশ্ন ছিল না। ছিল জীবন বাঁচানোর প্রয়াস।

অনুরূপা ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে: মা, তুমি তো জান, কোন্‌ অবস্থায় কিভাবে আমাকে টাকা আনতে হয়েছিল। আর সেই কারণে বাবার কাছে সারা জীবন ধরেই আমাকে ক্ষমা চাইতে হবে।

: তার কিছু প্রয়োজন নেই।

মায়ের কথা শুনে আরও দুঃখ হয় অনুরূপার। মনে মনে রাগ হয় তার নিজের ওপর। রাগ হয় সারা সংসারটার ওপর। মার কথার উত্তরে সে বললে: টাকার প্রয়োজনটাও কি অস্বীকার করো?

করুণা গম্ভীর হয়ে বলেন: সে কথা তুলে আর লাভ নেই এখন। মোটের ওপর, তোর টাকা উনি স্পর্শ করেননি, মর্যাদায় আঘাত লাগবে

বলে সে টাকা ভোগ করবার আগেই উনি চলে গেলেন, সে টাকা আমি কেমন করে হাত পেতে নেব ?

মাকে নিজের অসহায়তার কথা বললে অনুরূপা। আইনকে আশ্রয় করে কোম্পানি তাকে যোগ্য শিক্ষা দেবে সেকথাও বললে সে। কিন্তু কিছুতেই বোঝেন না করুণা। কিছুতেই নরম করতে পারেন না নিজের মনকে। অনুরূপাকে চুপ করে থাকতে দেখে বলেন ঃ কোনদিন তাঁর বিরুদ্ধে যাইনি। তাঁর মতের বাইরে কোনদিন কোনো কাজ করিনি। আজ তাঁর অবর্তমানে আমি সে মত একটুও বদলাবো না।

অনুরূপা বলে ঃ অনাহারে মরে গেলেও কুসংস্কারকে তাড়াতে পারবে না ?

ঃ নিজের সন্তানকে তাড়িয়ে দিলেও নয়। স্বামীর শিক্ষাই আমার সংস্কার, তা কু-ই হোক আর সু-ই হোক।

করুণার সেই কথাতেও অনুরূপা শেষবারের মতো বলে ঃ আইনের কাছে আমি যে নিরুপায় অবস্থায় পড়েছি তা যদি তুমি জানতে—

ঃ উপায় করতেও তো আমি বলিনি তোমায়। স্বেচ্ছায় তুমি নিজের পথ বেছে নিয়েছ। আমার মতও নাওনি। আমার দিক থেকে বাধা দেওয়ারও কোনো প্রশ্ন ওঠেনা।

অনুরূপা বলে ঃ খোকনের কথাটা একটু ভেবে দেখো মা। ওর পড়াশুনা—

তাকে থামিয়ে করুণা বললেন ঃ তোমাকে দয়া করে তা ভাবতে হবে না। তুমি নিজের কথা ভাবো। ওই ছোকরাটা তোমার মাথা খেয়েছে বুঝতে পারছি।

কান্নায় ভেঙে পড়ে অনুরূপা। বলে ঃ কারও কোন দোষ নেই মা। সব দোষ আমার। আমি আর পারছি না। আমাকে যে শাস্তি দিতে তোমার মন চায় দাও। আমি মাথা পেতে নেব।

থেকে চিঠি এল। চিঠির ভাষা পড়ে ভাবনায় পড়ল অনুরূপা। মনে মনে ঠিক করে সে, ছবিতে অভিনয়ই করবে। আজও যখন কোন চাকরি পাওয়া গেল না তখন উপায় কী? ভেবেছিল কোথাও কোনো কাজ পেলে যেমন করে হোক পাঁচশো টাকা সংগ্রহ করে রামলালের পায়ে ধরে নিষ্কৃতি চাইবে। কিন্তু সে আশা তার পূর্ণ হল না।

এক গুরুতর সমস্যায় পড়েছিল অনুরূপা। একদিকে এই উপবাসী সংসার আর একদিকে যুগযাত্রী চিত্র প্রতিষ্ঠান। এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে চোখ ফেটে তার জল এল। মনে মনে স্থির করল অভিনয়ই করবে সে। বাবার ছবিখানার দিকে এগিয়ে যায় সে। আপন মনে সেখানার দিকে চেয়ে বলে: বাবা, আমাকে তুমি ক্ষমা করো।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। করুণা ধূনো নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন তার পিছনে। বিরক্ত হয়ে বলেন: খুব হয়েছে। ওঁর নাম করে ক্ষমা চেয়ে আত্মার অশান্তি ঘটাস্‌নি।

মায়ের কথা শুনে খুব আঘাত পেয়েছিল অনুরূপা। করুণা কিছুতেই তার অপরাধ ক্ষমার চোখে দেখতে পারছেন না। একবারও বুঝতে চাইছেন না কোন্ সঙ্কট মুহূর্তে সে এনেছিল অতগুলো টাকা। সেখানে নিজের ভোগের কোন প্রশ্ন ছিল না। ছিল জীবন বাঁচানোর প্রয়াস।

অনুরূপা ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে: মা, তুমি তো জান, কোন্ অবস্থায় কিভাবে আমাকে টাকা আনতে হয়েছিল। আর সেই কারণে বাবার কাছে সারা জীবন ধরেই আমাকে ক্ষমা চাইতে হবে।

: তার কিছু প্রয়োজন নেই।

মায়ের কথা শুনে আরও দুঃখ হয় অনুরূপার। মনে মনে রাগ হয় তার নিজের ওপর। রাগ হয় সারা সংসারটার ওপর। মার কথার উত্তরে সে বললে: 'টাকার প্রয়োজনটাও কি অস্বীকার করো?

করুণা গম্ভীর হয়ে বলেন: সে কথা তুলে আর লাভ নেই এখন। মোটের ওপর, তোর টাকা উনি স্পর্শ করেননি, মর্যাদায় আঘাত লাগবে

বলে সে টাকা ভোগ করবার আগেই উনি চলে গেলেন, সে টাকা আমি কেমন করে হাত পেতে নেব ?

মাকে নিজের অসহায়তার কথা বললে অনুরূপা। আইনকে আশ্রয় করে কোম্পানি তাকে যোগ্য শিক্ষা দেবে সেকথাও বললে সে। কিন্তু কিছুতেই বোঝেন না করুণা। কিছুতেই নরম করতে পারেন না নিজের মনকে। অনুরূপাকে চুপ করে থাকতে দেখে বলেন : কোনদিন তাঁর বিরুদ্ধে যাইনি। তাঁর মতের বাইরে কোনদিন কোনো কাজ করিনি। আজ তাঁর অবর্তমানে আমি সে মত একটুও বদলাবো না।

অনুরূপা বলে : অনাহারে মরে গেলেও কুসংস্কারকে তাড়াতে পারবে না ?

: নিজের সন্তানকে তাড়িয়ে দিলেও নয়। স্বামীর শিক্ষাই আমার সংস্কার, তা কু-ই হোক আর সু-ই হোক।

করুণার সেই কথাতেও অনুরূপা শেষবারের মতো বলে : আইনের কাছে আমি যে নিরুপায় অবস্থায় পড়েছি তা যদি তুমি জানতে—

: উপায় করতেও তো আমি বলিনি তোমায়। স্বেচ্ছায় তুমি নিজের পথ বেছে নিয়েছ। আমার মতও নাওনি। আমার দিক থেকে বাধা দেওয়ারও কোনো প্রশ্ন ওঠেনা।

অনুরূপা বলে : খোকনের কথাটা একটু ভেবে দেখো মা। ওর পড়াশুনা—

তাকে থামিয়ে করুণা বললেন : তোমাকে দয়া করে তা ভাবতে হবে না। তুমি নিজের কথা ভাবো। ওই ছোকরাটা তোমার মাথা খেয়েছে বুঝতে পারছি।

কান্নায় ভেঙে পড়ে অনুরূপা। বলে : কারও কোন দোষ নেই মা। সব দোষ আমার। আমি আর পারছি না। আমাকে যে শাস্তি দিতে তোমার মন চায় দাও। আমি মাথা পেতে নেব।

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে করুণা বলেন ঃ শাস্তি বা শান্তি দেবার মালিক একজনই। তিনি মাথার ওপরে।

সে রাত্রে অনুরূপা কিছু খেতে পারেনি। শুধু জল খেয়ে শুয়ে পড়েছিল। অনেক রাত অবধি জেগে ছিল সে। এক ভীষণ যুদ্ধ একটা ভীষণ আলোড়ন প্রতি পলে তাকে অস্থির আর চঞ্চল করে তুলছিল। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে কী হবে এই জীবন রেখে। এই জীবনে কারও দরদ নেই সহানুভূতি নেই। কোনো লাভ নেই এই জীবন রেখে। মরবার কথা ভেবেছে সে বারবার। কিন্তু ভয় পেয়েছে। পারেনি মরণকে 'তুঁহু মম শ্যাম সমান' বলে আলিঙ্গন করতে। গত জন্মে কত পাপ করেছে সে। তাই প্রাত্যহিক জীবনের এই চরম গ্লানি আর পরম বেদনা নিয়ে কাটছে তার দিন। তার ওপরে আত্মঘাতী হয়ে যে মহাপাপের সিংহদ্বার খুলে দেবে তাতে এই জীবনের পরপারে তার কি ভয়ানক ফল ভোগ করতে হবে তাকে। এই কথা ভেবে শিউরে উঠেছিল অনুরূপা। না। মরবে না সে। বেঁচে থেকে দেখবে এই পৃথিবীকে। বইতে সে পড়েছিল, 'পূজা তাব সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা'। বাব বার পরাজয়ের মধ্য দিয়েও অপার সংগ্রামের মাঝে সে ভগবানকে খুঁজবে। খুঁজবে তার জীবনের শান্তি। অনেক রাত অবধি জেগে এইসব কথা ভেবেছিল অনুরূপা।

ঘুম থেকে পরের দিন উঠতে বেশ বেলা হয়ে গেল। মুখ হাত ধুয়ে চা খেয়ে সে করুণার কাছে গিয়ে বলে ঃ মা, আমার একটু কাজ আছে। আসতে দেরী হবে।

ঃ আচ্ছা। খুব আস্তে করুণা বললেন।

ঘুম থেকে উঠে অনুরূপা ভেবেছিল অতনুর খোঁজে একবার যাওয়া

দরকার। তার জীবনে আজকে যে সমস্যা, তার সূচনা হয়েছিল অতনুর দ্বারা। আজ যদি তার সমাধান কিছু হয় তা হলে তা-ও করবে সে। সেই কথা ভেবেই বাড়ি থেকে বেরোয় অনুরূপা। যুগযাত্রী চিত্রপ্রতিষ্ঠানের অফিসে গিয়ে শোনে অতনু কলকাতার বাইরে গেছে। ফিরতে বেশ কয়েকদিন দেরী হবে।

একথা শুনে খুব বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল অনুরূপা। আরও ভাবনায় পড়ল যখন শুনল অতনু রামলালকে বলে গেছে অনুরূপাকে উকিলের চিঠি দেবার জন্যে। ব্রীচ্ অফ কনট্রাক্ট-এর জন্যে জবাবদিহি করতে হবে তাকে। এই সব শুনে কিছুতেই কিছু ঠিক করে উঠতে পারছিল না সে। এই চক্রব্যূহ ভেদ করবার কোন ক্ষমতাই নেই তার। আর্থিক তো নয়ই। মানসিক বলও সে হারিয়েছে শোকে, অভাবে, মূঢ়তায় আর অনুশোচনায়।

বজ্রপানি আর শতদলের কথা শুনে সারাদিন রিহার্সাল দিয়েছিল অনুরূপা। নানা সমস্যার বোঝা তার মাথা এমন ভারী করে তুলেছিল যে সে ভুলে গিয়েছিল বাড়ির কথা, ভুলে গিয়েছিল সমস্ত দিন সে অভুক্ত। গত রাত্রেও সে উপবাসে কাটিয়েছে সে কথাও তার মনে ছিল না।

সন্ধ্যার আগে রিহার্সাল শেষ হল। যখন বাড়ির কাছে ট্যাক্সি থেকে নামে তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। বাড়িতে ঢুকে সে অবাক হয়ে যায়। তাদের ঘরগুলোতে তালা দেওয়া। একতলার এই ব্লকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ। কারও সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। পাশের বাড়ির একটি মেয়েকে সে দেখতে পেল সদর দরজার কাছে এসে। তাকে জিজ্ঞাসা করে কিছুই জানা গেল না। এদিক-ওদিক অনেক খুঁজে দেখল কোথাও চাবি রেখে গেছে কিনা। তা-ও পাওয়া গেল না। কাছাকাছি দু একটা মন্দিরে কখনও কখনও যেতেন করুণা। অবশ্য রাত্রে যেতেন না কোনদিন। যাই হোক, সেই কথা ভেবে মন্দিরগুলো

সন্ধান করবার জন্যে বাইরে বেরোতে উদ্যত হয় অনুরূপা। দরজার কাছে এসেই চমকে ওঠে সে। দেখে অন্ধকার পথের ধারে যমদূতের মতো দাঁড়িয়ে বাড়িওয়ালা ত্রৈলোক্য তালুকদার। ক্ষয়ে যাওয়া বিশ্রী দাঁতগুলো বার করে কুৎসিত এক হাসি ফোটে তার মুখে। অনুরূপা বলেঃ পথ ছাড়ুন।

ঃ এখনও এত তেজ? মা তো পালিয়েছে। এখন যাবে কোথায়?

অনুরূপার মাথাটা ঘুরে ওঠে। বলেঃ তার মানে?

ঃ মানে খুব সোজা। উচ্ছেদের নালিশ করেছিলাম। আজ দুপুরে সমন পেয়ে তোমার মা কোথায় সরে পড়েছে দেখছি।

তালুকদারের প্রতি ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় অনুরূপার সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে। অন্ধকারেও তার চোখ দুটো জ্বলে।

ঃ আপনি এত নীচ?

ঃ তুমিই বা এমন কি মহৎ!

রহস্যপূর্ণ হাসিতে ভরে যায় তালুকদারের মুখটা। সে হাসিতে ছিল প্রতিশোধের চরিতার্থতা আর একটা আত্মপ্রসাদের ছায়া। অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষিত বাসনা পূর্ণ হলে মানুষের যেমন আনন্দ হয়, এ ঠিক তেমনি নয়। এ যেন ভয়ঙ্কর একটা কিছু। তালুকদার ভেবেছিল এই অসহায় অবস্থায় অনুরূপা হয়ত নরম হয়ে যাবে, যত ঘৃণা আর অপমান ছিল ওই প্রৌঢ় লোকটির ওপর নিমেষে সব ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ঝড়ের রাতের ভীরু কপোতীর মতো আশ্রয় চাইবে তালুকদারের কাছে। কিন্তু সে আশা তার পূর্ণ হলো না।

পাশ কাটিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল অনুরূপা।

এক বছর পরের কথা। নতুন করে জন্ম হয়েছে অনুরূপার। যশ অপযশ অর্থ অনর্থ সব মিলিয়ে এক নতুন জীবন। টাকা পেয়েছে সে প্রয়োজনের অতিরিক্ত। কিন্তু আজ সে একা আর নিঃসঙ্গ। দিনের অনেকটা সময় কেটে যায় কাজ আর কোলাহলের মাঝে। তখন একরকম থাকে সে। মনে পড়ে না কাজ ছাড়া আর কিছু। নিশ্চিন্ত অবসরে মন-বিহঙ্গ যখন পাখা মেলে দেয় স্মরণের নিঃসীম আকাশে তখনই সে ফিরে যায় দূরে, অনেক দূরে। তখন মনে পড়ে হারানো দিনের কথা। সে জীবনে ঐশ্বর্যের অভাব ছিল কিন্তু অস্থিরতা ছিল না। সুখের অভাবে শান্তি ব্যাহত হয়নি সেদিন। আজকের এই জীবনের সঙ্গে সে তুলনা করে সেদিনের দিনগুলো। চমক ভেঙে আপন মনেই অনুরূপা মাথা নাড়ে। না, না। অশান্তির ভেতর দিয়ে বিত্তশালিনী হতে সে চায়নি। চায়নি নির্বাসনের মধ্যে আড়ম্বর আর ঐশ্বর্য।

কিন্তু কী লাভ এইসব ভেবে। তার অপরাধ কোথায় সে আজও বুঝতে পারে না। যেদিন সকালে অতনুর খোঁজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যায় সে ফিরে দেখল তার মা অরূপকে নিয়ে কোন কিছু না বলে চলে গেছেন, সেদিন তো সত্যিই তার দাঁড়াবার স্থান ছিল না। করুণা তখন একবারও ভেবে দেখেননি তার পরিণতির কথা। চরম ভুল বোঝাবুঝির মাঝে রাগ করে গোপনে চলে গেলেন তিনি। আশ্রয়হারা অনুরূপা কোথায় যাবে ভাবেন নি।

সেদিন অবশ্য আশ্রয় দেবার ইঙ্গিত ছিল তালুকদারের চাহনিতে। সন্ধ্যার অন্ধকারেও আশায় জ্বলছিল তালুকদারের চোখদুটো। বিনিময়ে যা মূল্য দিতে হবে তাও জানা ছিল অনুরূপার। ঘৃণায় শিউরে উঠে চলে এসেছিল সে। তারপর সারা কলকাতা জুড়ে কোথাও মাকে খুজতে বাকি রাখেনি। অনেক রাত পর্যন্ত অনেক অনুসন্ধান করেছিল সে। কোথাও খোঁজ না পেয়ে শেষে একটা হোটেলে একরাত্রির মতো আশ্রয় নেয়। প্রথমে সন্দেহ করে তারা তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছিল। তারপর নিজের বিপদের কথা বলে অনেক কষ্টে থাকবার অনুমতি পায় সে।

পরের দিন সকালে যায় যুগযাত্রী চিত্রপ্রতিষ্ঠানের অফিসে। সেদিন ওখানে অতনুর সঙ্গে দেখা হয় তার। সব কথা অকপটে সে তাকে বলে। সব শুনে অতনু বলে : যাবা যাবার, তাদের যেতে দাও।
অনুরূপা সে কথায় মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিল। তাই দেখে অতনু বলেছিল, তার মা ও ভাইকে খোঁজবার কোনো ত্রুটি রাখবে না সে। যাবে কোথায়! একদিন ক্ষমা করতেই হবে। খোঁজও পাওয়া যাবে একদিন।
সত্যিই একদিন খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। সে কাহিনী আরও করুণ।

অতনুর চেষ্টায় দক্ষিণ কলকাতায় অনুরূপার জন্যে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়া হয়। সেখানে সে একাই থাকে। একটি ঝি ও একটি চাকর নিয়ে তার সংসার। সুখে দুঃখে সেখানে কেটে যায় একটি বছর। এখন লোকের মুখে মুখে তার নাম। প্রথম শ্রেণীর একজন তারকা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে বাঙলা দেশের চিত্রাকাশে। রাস্তার দেওয়ালে দেওয়ালে তার ছবি। ট্রামে বাসে চায়ের দোকানে কলেজের ছেলেদের কাছে সে একটা আলোচনার বস্তু।

যুগযাত্রী চিত্রপ্রতিষ্ঠানের প্রথম ছবি 'নিঠুর দ্বন্দ্ব' প্রভূত জনসমাদর পেয়েছিল। রাতারাতি লোক অনুরূপাকে প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী বলে স্বীকার করে নিয়েছিল। তারপর ওদের আর একখানা ছবি 'প্রেম যুগে যুগে' তে আরও ভাল অভিনয় করেছে অনুরূপা। আরও খ্যাতি আরও অর্থ এসেছে তার কাছে। এখন ও সর্বসমেত চারখানা ছবিতে কাজ করছে। আরও নতুন কয়েকটাব সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। এ ছাড়া কয়েক মাস হলো 'রূপছন্দা' থিয়েটারে সে যোগ দিয়েছে। সেখানেও পেয়েছে প্রচুর জন-সমাদর। এসব আর ভাল লাগে না তার। মনে মনে ভাবে আগেব সেই জীবনই ছিল ভাল। প্রশস্তি আর অভিনন্দন জ্বালা ধরায় তার মনে। চিত্রামোদীদের কাছ থেকে পাওয়া অসংখ্য চিঠিগুলো না পড়েই ছিঁড়ে ফেলে দেয় সে। সেগুলো দেখলে বিরক্ত হয়ে ওঠে।

সবচেয়ে বেশি বিরক্ত হয় অতনুকে দেখলে। এতদিনে অতনুর স্বরূপ সে জানতে পেবেছে। তার রক্তে রক্তে অপরাধ-প্রবণতা ছিল অনুরূপা তা আগে জানত না। রেস আর মদ অতনুকে কোন্ পথে নিয়ে গেছে সেসব জানতে পেরেছে অনুরূপা। এটাও জানতে পেরেছে একদিন কেন অতনু তাকে প্রলুব্ধ করেছিল; কেন তাকে টাকার লোভ দেখিয়েছিল। তার পেছনে ছিল অনেক ঘৃণিত উদ্দেশ্য। অনুরূপা তাকে একটুও সাহায্য করেনি তার সে-সব উদ্দেশ্য পূরণ করতে। অতনু অনেক চেষ্টা করেছিল অন্ধকারেব অতল তলে অনুরূপাকে নামিয়ে দিতে। পারেনি সফল হতে। মনে মনে রাগ আছে অতনুর। অনুরূপার আছে ঘৃণা। কিন্তু অতনুকে তাব বাড়িতে আসতে নিষেধ করতে পারে না সে। নেশাগ্রস্ত হয়ে অতনু এলে তাকে সে যথেচ্ছ অপমান করে। তবুও সে আসে। জোর জুলুম করে তাকে টাকার জন্যে। প্রায়ই জোর করে টাকা নিয়ে যায়। নিরুপায় হয়ে অনুরূপা তার অত্যাচার সহ্য করে।

সেদিন অনুরূপার মনটা খুব খারাপ ছিল। একটুও ভাল লাগছিল না সকাল থেকে। নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে থিয়েটারে গিয়েছিল সে। সকলেই অবাক হয়েছিল একটু। মুখে কেউ কিছু বলে নি। থিয়েটার শেষ হতে মেক-আপ না তুলেই খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছিল। নিজের হাতে ফার্নিচারগুলো মুছতে লাগে। অনেক ভাল ভাল ফার্নিচার কিনেছে সে। টাকা দিয়ে কী-ই বা করবে। বজ্রপানি একদিন বলেছিল খুব শৌখিনভাবে থাকতে হবে। এগুলো অভিনেত্রীর পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজন। সে কথাটা ভাল করেই ভেবেছিল অনুরূপা।

টেলিফোন বেজে ওঠে। থিয়েটারের মালিক ফোন করছিল। কয়েক মিনিট তার সঙ্গে কথা বললে অনুরূপা। থিয়েটার শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই চলে আসাতে সে চিন্তিত হয়েছে। ভেবেছে অনুরূপা বুঝি অসুস্থ। এ ছাড়া আরও একটা কথা ছিল। কোন্ নেটিভ স্টেটের রাজা সেদিন থিয়েটার দেখতে এসেছিলেন। অনুরূপাকে একটা হীরে-বসানো নেকলেস উপহার দিতে চান তিনি।

ফোনটা নামিয়ে রেখে আপন মনেই হাসে অনুরূপা। মনের অবস্থা খারাপ থাকায় এমন কিছু ভাল অভিনয় সে করেনি সেদিন। তাই দেখে রাজার আবার উপহার দেবার শখ হল কেন? সেটা আবার কোন্ উদ্দেশ্য বয়ে নিয়ে আসছে? অনুরূপা চিন্তা করে মানুষগুলো ভাবে কী? হাসি পায় দুঃখও হয়।

হঠাৎ অতনু এসে হাজির হয়। সে এলেই অনুরূপার মনে পড়ে অরূপ আর করুণাকে। সব পুরানো কথা বলতে থাকে। অবসর সময়ে আজকাল প্রায়ই অনুরূপা ট্যাক্সি নিয়ে সারা শহর ঘুরে বেড়ায়। কোনদিন শহর ছেড়ে শহরতলিতেও তাকে ঘুরতে দেখা যায়। অতনু জানে অনুরূপা তার মাকে আজও খোঁজে। সব কাজের মাঝেও সেই বেদনার স্মৃতিটা তার মনকে নাড়া দেয়। কিছুক্ষণ অনুরূপার এই

রাস্তাঘাটে ইতস্তত ঘোরাফেরা নিয়ে কথা কাটাকাটি হয় দুজনের মধ্যে।
অতনু বলেঃ ভুলে যেও না, তুমি এখন আর সেই মধ্যবিত্ত ঘরের অনুরূপা নও। এখন তুমি প্রচুর টাকার মালিক নামকরা এক চিত্রতারকা।
অনুরূপা বলেঃ আমি চাই না এই বিলাস আর আড়ম্বর। এই স্তুতি আর স্তবগান চাই না। কাজ আব কোলাহলে আমার জীবনটা দুঃসহ হয়ে উঠেছে।
অতনু বোঝে হারানো দিনের কথায় অনুরূপার মনটা খারাপ হয়ে গেছে। আশ্চর্য। আজও সে ওদের ভুলতে পারল না। নিজের ইচ্ছায় যারা তাকে বিপদের মাঝে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে তারা আর যাই হোক, আপন জনের কর্তব্য করেনি। তাদের জন্যে মনের মাঝে কোন মায়া দয়া থাকাব মানে হয় না। তাদের কথা মনে করে দুঃখ ডেকে আনাও অর্থহীন। তবুও কঠিন না হয়ে গলায় একটু সহানুভূতি এনে অতনু বললেঃ জীবন মানেই তো কাজ আর কোলাহল। নীরব যেখানে জীবন সেখানে তো মৃত্যুর আবির্ভাব। এই সামান্য দিনেই তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ? ভেবে দেখ তো, একটা বছরের মধ্যে কী বিরাট ব্যাপার হয়ে গেল!
দুঃখের হাসি হেসে অনুরূপা বলেঃ বিবাট ব্যাপারই বটে। সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হলাম। শেষকালে বরাতে কি আছে জানি না।
অতনু একটু অবাক হয়। অনুরূপা কিছুতেই সহজ হতে পারছে না। অথচ তার মনটা ভাল হওয়া দরকার। কারণ আজ অতনুর কিছু টাকা পাওয়া চাই। মনের এই অবস্থার মাঝে সেই কথাটা তুলতে সাহস হচ্ছিল না তার। সুযোগ খুঁজছিল সে প্রতিনিয়ত। তাই অনুরূপাকে একটু খুশি করবার জন্যে বললেঃ আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কুসংস্কারে ভরা এক সংসারে তোমার প্রতিভার মৃত্যু হতো একদিন। অথচ আজ দেখো, হাজার হাজার মানুষের অভিনন্দন। এটা কি কম ভাগ্যের কথা।

অনুরূপার মনে ঘুরে ফিরে সেই এক কথাই বাজছিল। পূরবীর করুণ সুরেই তা বেজে চলছিল অবিরাম। সে সুখ চায় না, শান্তি চায়। নির্জনতাই তার ভাল, কোলাহল চায় না। অতনু নিজের হিসাবেই দুনিয়া দেখে। টাকা ছাড়া আর কিছু সে বোঝে না। স্নেহ, দয়া, মায়া এসবের বাঁধনের কোন দাম দেয় না সে। সে বলে, নিজেকে ভালবাস আর টাকাকে ভালবাস। তাতেই তার সুখ। সে কথা কোনদিন মেনে নিতে পারল না অনুরূপা। তাকে বারবার বলেও বোঝাতে পারেনি সে। অতনুর কথার বিপক্ষে অনুরূপা বলে : হতে পারে। কিন্তু মায়ের অভিশাপের বোঝা আমার সব অভিনন্দন ঢেকে দিয়েছে। আমি টাকা পেয়েছি সত্যি, সমাদরও পেয়েছি। সম্মান পেয়েছি কিনা জানি না।

অতনু একটা সিগারেট ধরায়। অনুরূপা উঠে দাঁড়িয়ে চোখ দুটো বন্ধ করে বলে : আজকের এই পাওয়ার বিনিময়ে আমি যা হারিয়েছি তার দাম আমার কাছে অনেক বেশি।

একটু ভেবে অতনু বলে : তোমার কর্তব্য তুমি করবার চেষ্টা করেছিলে। তারা তোমায় ভুল বুঝল। মিছে আক্ষেপ করে মন খারাপ করছ কেন ?

: কর্তব্যের চেষ্টা করেছি কিনা জানিনা। কিন্তু আক্ষেপের শেষ নেই আমার। আপনি জানেন, খোকনের খবর পেয়ে আমি তাকে দেখতে যাবার চেষ্টা করলে আমাকে জানানো হয়, তার সঙ্গে দেখা করবার অধিকার আমার নেই।

: আমাকে তো একথা জানাওনি তুমি। আমি একবার দেখে নিতাম কে এমন কথা বলে।

: তার কোন দরকার নেই বলেই বলিনি। জোর করে ভালবাসা নেওয়া যায় না, দেওয়াও যায় না। জীবনের চেয়ে সংস্কারকে যারা বড় করে দেখেছে তারা শান্তি পাক। তাদের ভাল হোক। তবে

দুঃখ হয়, তারা ভাবে না অভিনেত্রীর সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা সবই আছে। তাদের মনটাও সাধারণ মানুষের মত আনন্দে হাসে বেদনায় কাঁদে।

কথাগুলো বলে একটু দূরে একটা সোফায় বসে গা এলিয়ে দেয় অনুরূপা। রাত দশটা বেজে গেছে তখন। সাড়ে নটায় থিয়েটার থেকে ফিরেই উপরে উঠে গিয়েছিল অনুরূপা খুব দ্রুত। বাইরের ঘরে কয়েকজন লোক তার আসার আগে থেকে অপেক্ষা করছিল। বাড়ি ফেরার কয়েক মিনিট পরেই অতনু হাজির হয়েছে। তার সঙ্গে কথার পর কথা চলছিল এতক্ষণ। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে অনুরূপা। চোখ বন্ধ করে সোফায় বসেছিল সে। অতনুও স্থির হয়ে বসেছিল দূরে একটা চেয়ারে। চাকর যুধিষ্ঠির পর্দা ঠেলে অনুরূপাকে ডাকে।

: দিদিমণি!

: কি রে যুধিষ্ঠির?

: বাইরে যে সেই সন্ধ্যে থেকে কয়েকজন ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন।

: বলে দে আমার শরীর খারাপ। আজ আমার সঙ্গে দেখা হবে না।

অনুরূপার মেজাজটা দেখে যুধিষ্ঠির বোঝে ব্যাপার সুবিধার নয়। আর কথা বাড়ালে হাতের সামনে যা কিছু পাবে ভেঙেচুরে শেষ করবে সব। আজকাল দিদিমণি কথায় কথায় রেগে যায়। রেগে গেলে আর রক্ষা নেই। অতনুর দিকে একবার আড়চোখে তাকায় যুধিষ্ঠির। আশ্চর্য। অতনুবাবু এলেই যেন দিদিমণি আর সহজ মানুষ থাকে না। যুধিষ্ঠির ভাবে ও লোকটা না এলেই ভাল হয়। মাথা চুলকে যেতে যেতে সে আপন মনে বলে : কিন্তু একজন বুড়ো লোক সেই সন্ধ্যে থেকে বসে আছে। অনেক দূর থেকে এসেছে বলছিল। তাকে এখন কি বলি

সে কথাটা শুনতে পেয়ে যুধিষ্ঠিরকে আবার ডাকে অনুরূপা। বলে: এক এক করে পাশের ঘরে পাঠিয়ে দে। শুনতে পাসনি।
অবাক হয়ে যুধিষ্ঠির বলে: হ্যাঁ পেয়েছি। বাঁচালে দিদিমণি। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।
অনুরূপা আজকাল অতনুকে তুমি বলেই সম্বোধন করে। উঠে দাঁড়িয়ে আয়নার কাছে এসে মুখটা মুছে চুলগুলো ঠিক করে নেয় সে। অতনুকে বলে: আমার দেরী হবে। তুমি এখন আসতে পার।
: কথা সেরে এসো। আমি বসছি, একটু দরকার আছে।

অতনুকে বসিয়ে রেখে পাশের ঘরে গিয়ে অনুরূপা দেখে একটি বৃদ্ধ। উত্তরপাড়া থেকে এসেছেন। আতঙ্কনিগ্রহ সমিতির সভাপতি তিনি। অল্পদিন পরে তাঁদের সমিতির তরফ থেকে এক বিরাট বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। নামকরা সব শিল্পীরা সেই অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। কয়েকজন অভিনেতা অভিনেত্রীও উপস্থিত থাকবেন তখন। কিন্তু অনুষ্ঠানটিতে ঘোষণার দায়িত্ব নিতে হবে অনুরূপাকে। সে যদি ঘোষণার দায়িত্ব নেয় তাহলে আশাতীত টিকিট বিক্রি হবে। সফল হবে তাঁদের চেষ্টা।
সব শুনে অনুরূপা বললে: আমাকে পাবেন না। আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম।
দুঃখিতভাবে বৃদ্ধ বললেন: আপনার কাছে এসে ফিরে যাব ভাবতে পারিনি। একটা সাধু উদ্দেশ্যের জন্যে—
লোকটি তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন।
: সাধু উদ্দেশ্য? অনুরূপা প্রশ্ন করে।
: মানে একটি কন্যাদায়গ্রস্ত বৃদ্ধকে সাহায্য করা হচ্ছে কিনা তাই। আপনি অনুষ্ঠানে হাজির থাকলে লোকের দরজায় ঘুরে আর টিকিট বিক্রি করতে হত না। এই কথা শোনার পর লজ্জায় পড়ে অনুরূপা।

একটু কষ্ট করলে যদি তাদের সামান্য উপকার হয় তাহলে তাই করা যাবে। কন্যাদায়গ্রস্ত এক অসহায় বৃদ্ধ মেয়েকে পাত্রস্থ করবে আর তারই অর্থ সংগ্রহে আর এক বৃদ্ধ তার দ্বারস্থ। অনুরূপা কথা দিল নির্দিষ্ট দিনে সে যাবে।

বৃদ্ধ চলে যাবার পর এসেছিল কোন একটি সিনেমা মাসিক পত্রিকার রিপোর্টার। আগামী পূজা সংখ্যায় অনুরূপার জীবনী ছাপতে চায় তারা।

এ কথা শুনে হাসি পায় অনুরূপার। এ সব সে মোটেই পছন্দ করে না। ভদ্রলোকটির কাছে নানারকম প্রশংসার কথা শুনে রাগও হয় তার। কয়েক মিনিট কথা বলার পর অনুরূপা বলে ঃ দেখুন, জীবনের যেখানে শুরু, সেটাই জীবনী নয়।

সে কথা শুনেও ভদ্রলোক বলে ঃ পাঠকদের ভীষণ কৌতূহল আপনার কথা জানতে।

ঃ পাঠকের কৌতূহল মেটাবার আগ্রহ আমার একদম নেই। মাফ করবেন। যদি ভবিষ্যতে কোনদিন জীবনী প্রকাশ করার ইচ্ছে মনে জাগে তাহলে সবার আগে আপনাকেই ডেকে পাঠাবো। নমস্কার।

ভদ্রলোক তবুও দমবার পাত্র নয়। উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, যদি অনুরূপার কোন আপত্তি না থাকে তাহলে সেদিনের সেই কথাবার্তাটাই ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করবে।

অনুরূপা তাকে অনুমতি দিয়েছিল। আর, কোন কল্পনার রঙ চড়াতে নিষেধ করেছিল তাকে।

শেষ ব্যক্তি শুভ্রা সাবানের পাবলিসিটি অফিসার। সেই সাবান অনুরূপা কখনও ব্যবহার করেছে বলে মনে পড়ে না। তাকে শুভ্রা

সাবানের গুণাবলী সম্বন্ধে লিখে দিতে হবে। বিনিময়ে এক হাজার টাকা পাবে সে।

প্রথমে কিছুতেই রাজী হয়নি অনুরূপা। তারপর বলেছে সে লিখে দিতে রাজী আছে। সামান্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিখিল বঙ্গ নারী ত্রাণ সমিতিতে একহাজার টাকা দিয়ে দেবে সে। সেই কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল লোকটি। কিন্তু সে তো জানত না অনুরূপার মনের চেহারাটা।

সবাইকে বিদায় দিয়ে অনুরূপা এ ঘরে ফিরে এলো। এমনি ধরনের অনেক লোকের সঙ্গে রোজ তাকে সাক্ষাৎ করতে হয়। এমনি ধরনের আলাপ আলোচনায় সে বুঝতে পারে বাঙলা দেশের চিত্রজগতে সে পুরোপুরি স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু মানসিক উদ্বেগের জন্যে সেই প্রতিষ্ঠা সেই স্বীকৃতি একটুও আনন্দ দিতে পারে না তাকে।

অতনু তখনও চুপ করে বসেছিল। অনুরূপা ঘরে ঢুকে বলে: কি বলবার আছে বল। আমি খুব টায়ার্ড।

: বুঝতেই পারছ। কিছু টাকার বিশেষ প্রয়োজন। কালই একটা কাজে সাহেবগঞ্জ রওনা হচ্ছি। রামলালের কাছেও আমার পাওনার অতিরিক্ত নেওয়া হয়ে গেছে। এখন তুমি ছাড়া আমার গতি নেই।

: আমি কোথায় পাব?

নির্লিপ্ত কণ্ঠে অনুরূপার এই জবাব শুনে উঠে দাঁড়িয়ে কাছে এসে অতনু বলে—

: তাহলে বলতে চাও তোমার কাছে টাকা নেই?

: থাকলেও তার খরচের পথটা তোমার প্রয়োজনের সড়ক ধরে চলবে না নিশ্চয়ই!

একথা শুনে উত্তেজিত হয়ে ওঠে অতনু। সে হয়ত ভাবে তার দাবি আছে অনুরূপার ওপর। আর চিরদিন সেই দাবি সে মেটাবে। অধৈর্য হয়ে অতনু বলে: আমাকে টাকা পেতেই হবে।

ঃ দরকার মেটাতে পারলাম না বলে দুঃখিত। তুমি বরং অন্যত্র—

ঃ অন্যত্র চেষ্টা করার আর সময় নেই। অনেক রাত হয়েছে। তাছাড়া তুমি বোধ হয় জান না আজকাল কেনারামকে পেয়ে রামলাল আমাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

ঃ তোমাদের ওসব ব্যাপার আমার জানবারও দরকার নেই।

ঃ আচ্ছা, চলি তাহলে।

অতনু চলে যায়। কী কুক্ষণে তার দেখা হয়েছিল অতনুর সঙ্গে। তখন এত সব জানত না। আজ সারাক্ষণ ছায়ার মতো অনুরূপার পিছনে পিছনে ঘুরছে সে। অনুরূপা বুঝেছে অতনু তার জীবনে একটা দুষ্টগ্রহ। সত্যিই সে আজ ক্লান্ত। মন প্রাণ দিয়ে সে মুক্তি চায়। মুক্তি চায় এই গ্রহের হাত থেকে।

॥ সতের ॥

কলকাতা থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে একটি গ্রাম। গ্রামের নাম পলাশডাঙ্গী। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরতে গেলে এখান থেকে সাত ক্রোশ হাঁটতে হয়। গ্রামে ধারে কাছে রেললাইনও নেই। স্টেশন এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে। হাঁটা পথ অথবা গরুর গাড়ি ছাড়া যাবার উপায় নেই। ইউনিয়ন বোর্ড থেকে সরকারী সাহায্যে একটি চওড়া রাস্তা তৈরি হচ্ছে। সে রাস্তাটা চালু হলে অদূর ভবিষ্যতে হয়ত বাস যাতায়াত করবে। এই সব যাতায়াতের অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও গ্রামটা বেশ বর্ধিষ্ণু হয়ে উঠেছে। দাতব্য চিকিৎসালয় হয়েছে। হাসপাতালও স্থাপিত হয়েছিল বেসরকারী দানে। এখন সরকারী তত্ত্বাবধানে সেটা মোটামুটি ভালই দাঁড়িয়েছে। একজন এম. বি. ডাক্তার এসেছেন শহর থেকে। পাস করা নার্স আছে। প্রসূতি-সদনও একটা খোলা হয়েছে।

গ্রামে হাইস্কুল হয়েছে অনেকদিন আগে। এছাড়া প্রাথমিক স্কুলও আছে অনেকগুলো। আজকাল পড়াশুনার খুব প্রসার হচ্ছে দিন দিন। হাট বসে মস্ত বড়ো হাটতলায় সপ্তাহে দুদিন। সবই পাওয়া যায় হাটে।

সনাতন এই গ্রামের পোস্টমাস্টার। অনেকদিন কেটে গেছে তার এখানে। ঘরকুনো লোক সে। অফিস আর বাড়ি ছাড়া কিছুই জানে না। সরল অনাড়ম্বর লোক সনাতন। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে কুড়ি বছরের ওপর চাকরি করছে। চাকরিতে সে সুনামই কিনেছে।

একঘর ছেলেমেয়ে সনাতনের। স্ত্রী কালীতারাই সংসারের কর্ত্রী। সনাতন শুধু খাটে আর টাকা এনে তুলে দেয় স্ত্রীর হাতে।

কালীতারা গ্রামের মেয়ে। ছোটবেলায় কয়েকবার কলকাতায় গিয়েছিল। এখন আর মনে নেই। কলকাতার নাম শুনলে সনাতনও ঘাবড়ে যায়। গাড়িঘোড়া লোকজনের চিৎকার হল্লায় তার মাথা ধরে যায়। বেশ আছে সে গ্রামে। হরিনারায়ণের মৃত্যুর সংবাদ শুনে কলকাতায় যায় প্রায় দশবছর পরে। কলকাতা তার একটুও ভাল লাগেনি। কর্তব্যের খাতিরে কয়েকদিন ছিল। করুণার খুড়তুতো ভাই সনাতন। করুণার প্রতি তার একটা আলাদা ধরনের শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা ছিল। ছোটবেলায় বাপ মারা যাওয়ায় জ্যেঠামশাই অর্থাৎ করুণার বাবা পয়সা খরচ করে তাকে লেখাপড়া শেখান। পরে কালীতারাকে বিবাহ করে শ্বশুরের সুপারিশে পোস্ট অফিসে কাজ পায় সনাতন। নিজের কর্মদক্ষতায় আজ সে পলাশডাঙ্গা গ্রামের পোস্টমাস্টার।

বড় মেয়েটির বিয়ে দিয়েছে বছরখানেক আগে। একরকম গৌরীদানই বলতে হবে। বড় মেয়ের পর তিনটি ছেলে। তারপর আরও দুটি মেয়ে। এই হল সনাতনের সংসার। কালীতারা লেখাপড়া কিছুই জানে না। গ্রামের মাইনর স্কুলে ছোটবেলায় সে ভর্তি হয়েছিল। মামুলি চিঠি লেখবার মতো বিদ্যে হওয়ার আগেই তাকে স্কুল ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন তার বাবা। তারপর সে ঘরের কাজকর্ম শিখেছে। রান্না থেকে শুরু করে ছেলে মানুষ করা পর্যন্ত। স্বভাবটা তার একেবারে গ্রাম্য ধরনের। মজ্জায় মজ্জায় হিংসা আর পরশ্রীকাতরতা কোন্ সূত্রে সে পেয়েছে সনাতন তাই মাঝে মাঝে ভাবে।

সনাতন কিন্তু তার উল্টো। পরহিতব্রতী না হলেও পরশ্রীকাতর সে কোনদিন নয়। অসচ্ছলতার জন্যে ইচ্ছা থাকলেও পেরে ওঠে না মনের অনেক সাধ পূরণ করতে। কিন্তু কায়িক পরিশ্রমে কারও কোন উপকার করতে পারলে খুশিই হয় সে। জীবনে একবার যার কাছ

থেকে উপকার পেয়েছে প্রাণ দিয়েও সে তার প্রতিদান দেবার চেষ্টা করে।
সনাতন জ্যেঠামশাইয়ের পয়সায় লেখাপড়া শিখেছিল বলে করুণার কাছে নিজেকে ঋণী বলে মনে করত সব সময়ে। করুণা জ্যেঠামশাইয়ের একমাত্র মেয়ে। সংসারের চাপ যখন এত ছিল না তখন সে মাঝে মাঝে কলকাতায় যেত। করুণার জন্যে শাড়ি নিয়ে যেত এবং অনুরূপা আর অরূপের জন্যে খেলনা। এখন কাজ বেড়েছে সংসার বেড়েছে। ইচ্ছে থাকলেও পরের সংসারকে আপন করবার উপায় নেই আর। তাছাড়া কালীতারা একটি দিনও তাকে কোথাও নড়তে দেয় না। ক্রমে একেবারে ঘরমুখো স্বভাব হয়ে গেছে তার। হরিনারায়ণের মৃত্যুর খবর পেয়ে করুণার বৈধব্যে খুব দুঃখ পেয়েছিল সনাতন। তাকে কিছুদিনের জন্যে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। করুণা বলেছিল ঃ যদি এখানে ভাল না লাগে তাহলে তোর কাছে যাব নিশ্চয়ই। কদিন থেকে আসব ওখানে।

মানুষ বোধহয় দুদিনের অতিথিকেই আপ্যায়িত করে। চিরদিনের বোঝা কেউ চায় না। এই নির্মম সত্য করুণা বুঝতে পেরেছিলেন সনাতনের আশ্রয়ে কিছুদিন কাটিয়ে।
অনুরূপা যেদিন সকালে করুণার কাছে অনুমতি একরকম না নিয়েই কাজের অছিলায় বাড়ি থেকে বেরুল সেইদিন করুণার মনটা খুব খারাপ ছিল। তার আগে কয়েকদিন ধরে মেয়ের সঙ্গে একটা ভুল বোঝাবুঝির পালা চলছিল। করুণা বোধ হয় ভাবছিলেন অনুরূপার ইচ্ছা ছবিতে অভিনয় করার। তিনিই হয়তো সে পথের প্রতিবন্ধক। এই সব ভাবতে ভাবতে বেলা দুটো বেজে যায়। অনুরূপা তখনও ফিরলো না দেখে তিনি ভাবেন সে রাগ করে চলে গেছে। ভেবেছিলেন যদি যায় যাক। অনেক অপমান করেছে অনুরূপা। এতটা তিনি তার কাছে আশা করেন নি।

সেদিনের কথা মনে পড়ে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয় হয়। অনুরূপা তখনও এলো না। এলো এক পেয়াদা। হাতে তার আদালতের সমন। উচ্ছেদের মামলা করেছে বাড়িওয়ালা তালুকদার। করুণা সমন ফেরত দিলেন। সই করে নিলেন না সেখানা। অপমানে লজ্জায় ভয়ে কাঠ হয়ে গেলেন তিনি। এরপর ভাগ্যে কি আছে তাই ভাবতে লাগলেন। অনুরূপার কথা আবার মনে পড়ল। মনে পড়ল কয়েকদিন আগে তালুকদারকে অপমান করার কথা। রাগে কাঁপতে কাঁপতে যাবার সময়ে তালুকদার নালিশের ভয় দেখিয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সেই চরম শিক্ষাই দিল সে। কিন্তু কার জন্যে? এ অপরাধ কার? এর জন্যে দায়ী সেই হতভাগী মেয়েটা। তারই দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ নিতে তালুকদার আজ মেতে উঠেছে। পুলিস ডেকে তাড়িয়ে দেবার আগে এ বাড়িকে প্রণাম জানিয়ে চলে যাওয়াই ভাল। অনুরূপাকে স্বামী ক্ষমা করে যেতে পারেন নি। করুণাও পারবেন না তাকে ক্ষমা করতে। তার যা খুশি সে করুক। কোন বাধা তিনি আর দেবেন না। কোনদিন আসবেন না কোন কথা বলতে।

অরূপকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন করুণা। সঙ্গে অতি প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস আর পরনের কাপড় সমেত একটি স্যুটকেশ। বাড়ি থেকে হাওড়া। হাওড়া থেকে পলাশডাঙ্গা। কোন জিনিসের ওপর আর টান নেই তাঁর। সব পড়ে রইল ঘরে।

পথে লোককে জিজ্ঞাসা করে যখন সনাতনের বাড়িতে গিয়ে তারা পৌঁছায় তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। শীতের কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া কাঁপিয়ে দিচ্ছিল তাদের। সূচীভেদ্য অন্ধকার চারিদিকে। শুধু ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শোনা যায়। সনাতন করুণাকে আসতে দেখে খুশি হয়েছিল। কিন্তু অবাক হ'ল অনুরূপাকে দেখতে না পেয়ে।

মুখ হাত ধুয়ে করুণা সব কথা বললে সনাতনকে। করুণা বললে, তার

মনে হয় অনুরূপা বাড়ি ছেড়ে তাদের ছেড়ে চলে গেছে। শুনে খুব ভাবনা হল সনাতনের। সে বললে, পরের দিন সে যাবে কলকাতায় অনুরূপার খোঁজে।

পরের দিন যাওয়া হয়ে ওঠেনি তার। জেলা থেকে সুপারভাইজার এসেছিলেন। দুদিন তিনি অফিসের কাজ পরিদর্শন করেছিলেন। তৃতীয় দিন ছুটি পেল সনাতন। কলকাতায় গেল সে। করুণা তার সঙ্গে যেতে কিছুতেই রাজী হলেন না।

কলকাতায় অনুরূপাদের পুরানো বাড়িটায় গিয়ে কোন সংবাদ পেল না সে। যুগযাত্রী চিত্র প্রতিষ্ঠানের নামও জানা ছিল না তার। সারাদিন ধরে অনেক ফিল্ম কোম্পানির অফিস খুঁজল। কোথাও সন্ধান না পেয়ে সন্ধ্যার গাড়িতে আবার ফিরে এল সে। তারপর আর কোন খোঁজ পায়নি তারা। খবরের কাগজে পরে যখন অনুরূপার নাম আর ছবি দেখেছে তখন তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবার দরকার মনে করেনি সনাতন।

এ যুগের মানুষ হলেও সনাতনের মনটা ছিল প্রাচীনপন্থী। এক মুহূর্তেই অনুরূপার প্রতি মনটা তার বিরূপ হয়ে উঠল। করুণাকে বললে : তুমি জেনে রাখো তোমার মেয়ে মরে গেছে।

সে কথা মেনে নিলেন করুণা।

অনুরূপাকে করুণা ভুলতে চেষ্টা করেছিলেন। ভায়ের সংসারে কাজকর্ম করে তাঁর দিন কাটে। নতুন বছরের শুরুতে অরূপকে সনাতন গ্রামের হাইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল। সনাতন নিজে স্কুলের অন্যতম কমিটি মেম্বার। সেখানে বিনা মাইনেতে অরূপের ভর্তি হওয়ার কোন অসুবিধা হয়নি। করুণা এতদিনে নিশ্চিন্ত হলেন। ছেলেটার লেখা-পড়ার জন্যে তাঁর খুব চিন্তা ছিল। সনাতন সে চিন্তা থেকে তাঁকে মুক্তি দিয়েছে। আত্মীয়ের যোগ্য কাজই সে করেছে।

পলাশডাঙ্গা গ্রামে দেখতে দেখতে কয়েকটা মাস কেটে যায় করুণার। ক্রমে তিনি বুঝতে পারেন কালীতারার ব্যবহারটার চেহারা বদলে যাচ্ছে। কথায় কথায় অকারণে রেগে ওঠে কালীতারা। বিনা দোষে ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে নির্মমভাবে মারতে থাকে। অকারণে ঝগড়া করে সনাতনের সঙ্গে। সনাতন মুখ টিপে এ সব সহ্য করে। এমনি ধরনের অশান্তি দেখে করুণা খুব বিব্রত হয়ে পড়েন। তার কারণও মনে মনে খুঁজতে থাকেন।

একদিন কারণ জানা গেল। অনেক রাতে কথা বলছিল কালীতারা আর সনাতন। পাশের ঘরে করুণা তখনও জেগে। কালীতারা চায় না চিরদিন করুণা সনাতনের গলগ্রহ হয়ে থাকে। কালীতারা কোথায় পাবে? তার অভাবের সংসার। তার ওপর আজ একাদশী কাল পূর্ণিমা পরশু অম্বুবাচী আরও কত কি। চোখের সামনে সনাতনের এত কষ্ট সে দেখতে পারবে না। তার চেয়ে সনাতন কালীতারাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুক।

স্ত্রীর কাছে এইসব কথা শুনবে আশা করেনি সনাতন। সে খুব বিনীত ভাবে বলেছিল, করুণা তার দিদি। সে বড় দুঃখী। নিজের হাজার কষ্ট হলেও সে তাকে আশ্রয় না দিয়ে পারে না। তাছাড়া অন্নপূর্ণা স্কুলে পড়ছে। একটা বছর পরেই সে ফাইনাল পরীক্ষা দেবে। তারপর একটা চাকরি বাকরি সংগ্রহ করতে পারলে তারা নিশ্চয়ই চলে যাবে। তাছাড়া তারা নিজে থেকে এখানে আসেনি। সনাতনের আমন্ত্রণেই এসেছে।

কালীতারা তার পরেও ঝগড়া করেছিল স্বামীর সঙ্গে। সে সব কথা ভাসা ভাসা ভাবে শুনেছে করুণা। শেষ কথা কালীতারা বলেছে সনাতনকে: আপনি খেতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।

পাশের ঘরে বিনিদ্র রাতে অস্থির হয়ে উঠেছিল করুণা। কালীতারার

ভেতরে একটা হিংসুটে ঘোর স্বার্থপর আত্মসর্বস্ব নারী লুকিয়ে আছে, যার চেহারাটা বাইরে থেকে অনুমান করা যায় না। সত্যিই তো করুণা তার কে? নিজের অংশ থেকে অপরকে ভাগ দেবার মতো উদারতা যদি কালীতারার না থাকে তাহলে দুঃখ করে লাভ নেই। এর জন্যে দায়ী করুণার কর্মফল। একবার তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল সেই রাত্রেই কোথাও চলে যান কাউকে কিছু না বলেই। কিন্তু যেতে পারলেন না শেষ পর্যন্ত। দেখা যাক না কি হয়। সনাতন তো কোনদিন কিছু বলেনি। বরং আনন্দিতই হয়েছে তাঁকে পেয়ে। নিজের ঋণমুক্তির আনন্দে সে মাথায় করে রেখেছে করুণা আর অরূপকে।

তারপর মাঝে মাঝে কালীতারার মুখে আরও কিছু কিছু মন্তব্য শুনেছেন করুণা। অবশ্য স্বার্থের খাতিরে অরূপকে সে একটু ভাল চোখেই দেখত। বাড়ির সব খুচরো কাজকর্ম অরূপ করে দিত। সনাতনকে অফিসের কাজ ছাড়া আর কিছু ভাবতে হতো না। তাছাড়া সকালে ও সন্ধ্যায় ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে পড়াতো অরূপ। এটাও কম লাভ নয়। দুমুঠো ভাতের বিনিময়ে এই খাটিয়ে নেওয়াটা বেশ লাভজনক বলে নিশ্চয়ই মনে হয়েছিল কালীতারার।

একদিন কথায় কথায় করুণাকে কালীতারা বললে: আপনার ভাই ছাপোষা মানুষ। শুধু খেটেই সারা। ভাল খাওয়া পর্যন্ত জোটে না। তার ওপরে আপনাদের দুটো বাড়তি পেট।

অপমানে করুণার কান দুটো গরম হয়ে উঠেছিল। এমনি ধরনের কথা শোনার আগেই এখানকার আশ্রয় ত্যাগ করে চলে যাওয়া তার উচিত ছিল। আরও কত তার অদৃষ্টে আছে কে জানে। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে কালীতারা বললে: তাই বলছিলাম কি ঘরে বসে দুটি মুড়ি ভাজলেই তো পারেন। সংসারে একটু সাশ্রয় হতো।

সেখানে আর থাকা চলে না এই কথাই বুঝেছিলেন করুণা। সনাতন

স্ত্রীর হাতের পুতুল। তবুও কালীতারার কথায় চলে গেলে সনাতন দুঃখ পাবে ঠিকই। কিন্তু এই কথা শোনার পর নিজেকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

স্থানীয় হাই স্কুলের হেডমাস্টারের স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল করুণার। বেশ বুদ্ধিমতী শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা। করুণা সব কথা অকপটে তাকে জানিয়েছিলেন। একটা কোন নির্ভরযোগ্য আশ্রয়ের কথা তাকে চিন্তা করতে বলেছিলেন। কয়েক দিন পরে ভদ্রমহিলা করুণাকে বললেঃ খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে একটি রুগ্ণ লোককে দেখাশুনা করার জন্যে নির্ঝঞ্ঝাট মহিলা চাই। খাওয়া থাকা ছাড়া মাসিক বেতন তিরিশ টাকা।

ঠিকানাটা তাব কাছে নিয়ে সেইদিনই করুণা চলে এলেন সনাতনের আশ্রয় ছেড়ে। সনাতন তখন অফিসে। অরূপ তখন স্কুলে। অরূপকে একটা চিঠি লিখে এলেন তিনি। ভালভাবে তাকে পড়াশুনা করার পরামর্শ দিলেন। মাঝে মাঝে তার সঙ্গে দেখা করে যাবারও প্রতিশ্রুতি ছিল সেই চিঠিতে।

আবার সেই কলকাতা। দীর্ঘদিন আগে যে কলকাতাকে প্রণাম জানিয়ে চলে এসেছিলেন করুণা। এমনি ভাবেই বুঝি তাঁকে ঘুরতে হবে জীবনের ঘাটে ঘাটে। এর কোথায় শেষ তা কেউ জানে না। চলে আসার সময়ে কালীতারাকে তিনি আশীর্বাদ করেছিলেন। কালীতারা সুখী হোক। শান্তি ফিরে আসুক তাদের সংসারে। ভগবান তাদের মঙ্গল করুন।

॥ আঠার ॥

অনুরূপা এখন আরও কাজে ব্যস্ত। একটুও সময় নেই তার। উদয়াচল ফিল্ম কোম্পানির হয়ে একখানা ছবিতে অভিনয় করছিল সে। পুরোদমে স্যুটিং চলছিল। তার ওপরে থিয়েটারে নতুন বই খোলা হচ্ছে। তার মহলাও চলছে নিয়মিত। যুগযাত্রী চিত্র প্রতিষ্ঠানের পরবর্তী ছবিব রিহার্সাল চলছে। সকাল থেকে শুধু কাজ আর কাজ। ভাল লাগে না অনুরূপার। কিন্তু তার ছাড়ান নেই। চারিদিক থেকে আসছে নানান চাপ। অভিনয়কে যখন পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছে তখন পেছিয়ে গেলে চলবে না।

টাকায় আর কোন মায়া নেই অনুরূপার। সে গাড়ি কিনেছে। ইচ্ছে করলে ছোটখাটো একটা বাড়িও তৈরি করতে পারে। কিন্তু করবে কার জন্যে। যাদের মুখ চেয়ে তার মন একদিন অতনুর প্রস্তাবে সায় দিয়েছিল তারা আজ হারিয়ে গেছে এই পৃথিবীর বিপুল জনারণ্যে। থেকেও তাবা নেই। কোন সম্পর্কই আর রইলো না তাদের সঙ্গে। মাকে আর পারবে না মা বলে ডাকতে। ভাইকে ভাই বলে আলিঙ্গন করতে পারবে না। কে বুঝবে তার মনের এই ভয়ঙ্কর অবস্থা? বাইরে থেকে লোকে তাকে দেখে হিংসা করে। বিত্তের কথা স্মরণ করে চিত্তে তাদের দোলা লাগে। কিন্তু কী নিদারুণ দাহ নিয়ে শুরু হয় তার প্রতিটি দিন সে খবর কেউ রাখে না। অল্প কয়েকটি লোক ছাড়া জানেও না কেউ সে কথা।

অনুরূপা একজন সত্যিকারের অভিনেত্রী। যখন সে অভিনয় করে

তখন পার্থিব জগতের কোন কিছুই তার মনে পড়ে না। চরিত্রের সঙ্গে মিশিয়ে দেয় সে নিজেকে। ভুলে যায় তার অতীত বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব। আবার অভিনয় যখন শেষ হয়ে যায়, আশপাশে যখন কেউ থাকে না, একা ঘরে যখন মনটা ফিরে যায় শুধু নিজের কথা খুঁজে খুঁজে কুড়িয়ে আনতে, তখন সে সম্পূর্ণ আলাদা এক নারী। তখন সে ভাবে সে কাঁদে। অন্য এক চোখ দিয়ে দেখে তার জীবন-নাট্যের এক একটি দৃশ্য।

প্রচুর অভিজ্ঞতা হয়েছে অনুরূপার। এই অল্পদিনে এই পৃথিবীর অনেক অজানা রহস্যের সন্ধান পেয়েছে সে। বিচিত্র সে অভিজ্ঞতা। ঘৃণায় আর বিতৃষ্ণায় ভরে গেছে তার মন। কুৎসিত মন্তব্য করে কত চিঠি এসেছে তার কাছে। পথে যেতে যেতে পথচারী লোকের কাছে কত অশ্লীল কথা শুনতে হয়েছে তাকে। প্রথম প্রথম খুব খারাপ লাগত তার। আজকাল সব গা-সওয়া হয়ে গেছে।

তার মনে সবচেয়ে বেশী ঘৃণা এনেছে অতনু। অতনুর সবকিছু জেনে ফেলেছে সে। এটুকুও জেনেছে মেয়েমানুষের প্রতি অতনুর আসক্তি কম। তার মোহ রেস আর মদ। কতদিন মাতাল অবস্থায় অতনু এসেছে তার কাছে। বরাবরই অনুরূপা মাতালদের ভয় করে। তাড়াতাড়ি রেহাই পাবার জন্যে অতনু যা টাকা চেয়েছে তাই দিয়ে বিদায় করেছে তাকে। তবু চাওয়ার মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলেছে তার। পাওয়ার আশাও বোধ হয় মিটবে না কোনদিন। অনুরূপা আর পারে না। জেনেশুনেও একজনের উচ্ছৃঙ্খলতা মেটাতে সে আর টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারে না।

অতনুর কথা ভাবে অনুরূপা। অদ্ভুত চরিত্রের এক মানুষ। দিনের বেলাতে সে একরকম থাকে। রাত্রি হলেই তার চেহারা অন্যরকম। তার কোথায় ব্যথা, কি বেদনা তা আজও অনুরূপা জানতে পারেনি। জানতে

চেষ্টাও সে করেনি কোনদিন। মাঝে মাঝে মনকে প্রশ্ন করেছে, কেন অতনু এমন হল? ভেবেছে নানান জঘন্য অপরাধের মধ্যে নিজেকে না জড়িয়ে অনুরূপার ওপর যদি তার আসক্তি আসত তাহলে সে একটুও আশ্চর্য হতো না। জীবনের এই আঁধার পথ ছেড়ে অতনু যদি জোর করে অনুরূপার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাকে নিয়ে ঘর বাঁধবার চেষ্টা করত তাহলে খুশী হতো। কিন্তু অতনু শুধু বোঝে টাকা মদ আর রেস। কলেজে পড়বার সময়ে অনুরূপা একটা বই পড়েছিল। তাতে একটা প্রবন্ধ ছিল। যুক্তি দিয়ে লেখক দেখিয়েছিলেন জুয়া যৌন-আসক্তির প্রতিবন্ধক। আজ অতনুকে দেখে সে কথার সত্যতা বুঝতে পারে অনুরূপা।

সবচেয়ে ঘৃণার কথা অপরের আসক্তির সুযোগ নিয়ে টাকা উপায় করতে চায় অতনু। সে কথা জানতে পেরে তাকে একটা পশুর চেয়েও নীচ মনে হয়েছিল অনুরূপার। কিছুদিন আগে কোন এক রাজাবাহাদুর থিয়েটারে অনুরূপার অভিনয় দেখে তাকে একটা হীরেব নেকলেস দিয়েছিলেন। অতনু সে কথা শুনে সুযোগ নিতে ছাড়েনি। রাজাবাহাদুরের সঙ্গে কেমনভাবে সে যোগাযোগ করেছিল তাও অনুরূপার অজানা। একদিন সন্ধ্যায় অনুরূপা দেখে বিরাট একটা গাড়ি এসে থামল তার বাড়ির দরজায়। গাড়ি থেকে নামল অতনু আর রাজাবাহাদুর। নেশার ঘোরে পা ঠিক রাখতে পারছে না তারা।

উপর থেকে তাই দেখে অনুরূপা ভেবেছিল সেই মুহূর্তে তাড়িয়ে দেবে তাদের। দরকার হলে পুলিস ডাকতেও সে পিছিয়ে যাবে না। পরক্ষণে ভেবেছে স্থানীয় পুলিস অফিসার অনেকেই অতনুর পরিচিত। আর এই অবস্থায় তাকে কিছু বললে যদি সে গোলমাল করে অথবা চিৎকার করে কোন গালিগালাজ দেয় তাহলে এক বিশ্রী দৃশ্যের অবতারণা হবে। অতনুর গায়ের চামড়া অনেক মোটা। রাজাবাহাদুরকেও

এখানে কেউ চেনে না। অপমানটা লাগিবে অনুরূপারই গায়ে। সেই কথা ভেবে আর কিছু বলতে পারেনি সে।
রাজাবাহাদুরকে নিয়ে এসে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় অতনু। অনুরূপা সাদর অভ্যর্থনা করে তাদের। নিজের হাতে চা ও জলখাবার পরিবেশন করে। অতনু কিছুই খেলে না। একপাশে সরিয়ে রাখতে গিয়ে কাঁচের কাপ-ডিসগুলো সব ভেঙে ফেললে। এই অবস্থা দেখে অনুরূপা এক গ্লাস লেবুর শরবত এনে খাইয়ে দেয় তাকে।

কিছু পরে একটু সুস্থ হল অতনু। তবুও কথাবার্তায় সে তখনও যথেষ্ট অভদ্র। জড়িয়ে জড়িয়ে সে বললে : রাজাবাহাদুরকে একটা গান শোনাও।
: আজ নয়। পরে হবে। তুমি আজ খুব অসুস্থ।
: কে বললে আমি অসুস্থ। বলতে পার একটু ইয়ে ম্যানে অন্যরকম। তাই বলে অসুস্থ আমি নই।
ভদ্রতার খাতিরে রাজাবাহাদুরের সঙ্গে কয়েকটা কথা বললে অনুরূপা। অতনু চুপ করে বসে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর অনুরূপাকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে বলে যে, রাজাবাহাদুর তার রূপে মুগ্ধ। তার গান শোনবাব জন্যে তিনি পাগল। অনুরূপা যদি গান শোনাতে রাজী হয় আর তার এখানে বসে যদি সামান্য পানাহার করবার অনুমতি দেয় তাহলে অনেক সুবিধা হবে তার। অনেক আশা নিয়ে অতনু এসেছে।
সেদিন অতনুর কথাগুলো শুনে রাগে অনুরূপার সর্বাঙ্গ জ্বলে গিয়েছিল। অতনু তাকে ভাবে কী? সে কি পণ্যা? তার কি আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদা কিছুই থাকতে নেই? জীবনধারণের জন্যে ভাগ্যের ভেলায় ভাসতে ভাসতে অনুরূপা আজ চিত্রতারকা। তাই বলে তার কি রুচি থাকবে না, সংযম থাকবে না? অতনুর হাতের ক্রীড়নক হয়েই কি তাকে সারাজীবন কাটাতে হবে?

না। সে তা পারবে না। আজ অতনু এই প্রস্তাব নিয়ে এসেছে কাল আরও ঘৃণ্যতর প্রস্তাব নিয়ে আসবে হয়ত। আবার কোন পথের প্ররোচনা দেবে তাকে সে কথা ভাবতে গিয়ে মাথা ঘুরে যায় তার। অনুরূপা কঠোর হয়ে অতনুর কথার প্রতিবাদ করে।
তার কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সে রাতে রাজাবাহাদুরকে সঙ্গে নিয়ে বিদায় নেয় অতনু।

অতনুর কাছ থকে ছাড়াও আবও অনেক প্রলোভন আসে অনুরূপার কাছে। সেগুলো ভেবে হাসি পায কিন্তু দুঃখ হয় আব বাগ হয় অতনুর কথা ভেবে। তাকে সে এতটা নীচ ভাবতে পাবেনি আগে। ভাবতে পারেনি সমাজের এত নিচু স্তবে তার মেলামেশা। পাঁকেব তলায় সে তলিয়ে গেছে একথাটা জানতে পাবেনি অনুরূপা। তাই দুঃখ হয়েছে অতনুর কথা ভেবে। মনে মনে তাব একটা ছবি সে এঁকেছিল প্রথম যেদিন সকালে তাদেব বাড়িতে তাকে সে দেখে। সেদিন অনেক রহস্য অনেক কৌতূহল অতনুব সব কথা ভেদ কবে অনুরূপাব মনে উঁকি দিয়েছিল। কিন্তু তাব ওপবেও ভালয় মন্দয় মেশানো একটা সাধারণ মানুষেব চেয়ে নিচে সে অতনুকে দেখেনি। আজ তার ধাবণা পাল্‌টে গেছে। ব্যথা পেয়েছে সে মনে মনে।

অনেকদিন আগে অতনু একদিন নেশা করে তাব বাড়ি আসে। সেদিন থিয়েটার ছিল না। ঘবেই ছিল অনুরূপা। তার আগেই অতনু তার কাছে হয়ে উঠেছে একটা বিস্ময় একটা জিজ্ঞাসা।
অতনুকে অনুরূপা বলেছিল : ওগুলো খাও কেন?
: না খেলে বাঁচব না বলে।
: ছেড়ে দিয়ে দেখেছ কোনদিন?
: ভাবতে পারি না সে কথা।

আরও অনেক কথা হয়েছিল দুজনের মধ্যে। অনুরূপা বলেছিল:
আচ্ছা, অতনু, তুমি কি চাও বলতে পারো?
: বিশ্বাস করো, কী চাই আমি নিজেই জানি না।
: নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করে দেখেছ?
অতনু সে কথায় হেসেছিল। বলেছিল: জানো অনু, ওই মনটাই চিরদিন আমার সঙ্গে শত্রুতা করেছে। আমার সঙ্গে আমার মনের বোঝাপড়া আজও হল না। কোনদিন হবে বলে মনেও হয় না।
: তুমি আমাকে অবাক করলে অতনু।
: এত তাড়াতাড়ি তোমাকে অবাক করলাম?
অতনু চেয়েছিল অনুরূপার দিকে। দৃষ্টিতে ছিল নিরাসক্ত ভাব কিন্তু মস্ত বড় এক প্রশ্ন। সেদিন সে বোধ হয় ভেবেছিল অনুরূপাকে নিয়ে তার খেলার এই তো সবে শুরু। এরই মধ্যে যদি অবাক হয়ে যায় অনুরূপা, তাহলে তাতে অতনুর অযোগ্যতাই প্রমাণিত হবে। আজ অনুরূপা সেই কথা ভাবে। সত্যিই, তারপর সে অনেক জেনেছে। অতনু তার কাছে দেখা দিয়েছে নিত্য নতুন বেশে। আজ তার ওপর রাগ হয় ঘৃণা হয়। সেদিন কিন্তু অনুকম্পা আর দরদ একেবারে চলে যায়নি অনুরূপার মন থেকে।
অতনুর হাতদুটি ধরে অনুরূপা বলেছিল: তুমি কি ভাল হতে পার না অতনু? মরীচিকার পেছনে পেছনে না ছুটে সহজ জীবনে ফিরে আসতে পার না?
: ভুল করছ অনু। আমি ছুটি না। মরীচিকা আমাকে টানে।
: ওই একই কথা হল। কেন তুমি জয় করতে পার না সেই টান? কেন তুমি সংযমের শেকলে নিজেকে বেঁধে রাখতে পার না?
অনুরূপার কথাগুলো অতনুর নেশাগ্রস্ত মনকেও দোলা দিয়েছিল। তার দুঃখ হয়েছিল একটা জীবন যা সুন্দর সফল হতে পারত তা দিনের পর দিন এমনভাবে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে দেখে। অতনুও বুঝতে

পেয়েছিল অনুরূপার কথাগুলো শুধু কথার কথা নয়। তার ভেতরে ছিল· একটা আকুতি। একটা দরদের মূর্ছনা অনুরণিত হয়ে উঠেছিল তার কথায়। দরদী শিল্পীর হাতে তারযন্ত্রে যেমন সুর ওঠে, ঠিক তেমনি। আর কেউ কোনদিন অতনুকে এমনভাবে বলে নি। তার ভালমন্দের বিচার এমন সুন্দর ভাবে কেউ তাকে বুঝিয়ে দেয় নি কখনও। তবুও সে সব কথার কোন জবাব দিতে পারে নি সে।

তারপর লজ্জায় কয়েকদিন ,সে অনুরূপার সঙ্গে দেখা করে নি। অনুরূপারও ঘৃণা হয়েছিল নিজের ওপর। একটা পুরুষকে সৎপথে ফিরিয়ে নিয়ে যাবাব ক্ষমতা তার মোটেই নেই সেই কথা ভেবে।

সৎপথে ফিরে আসা দূবে থাক, অনুরূপার চোখের সামনে অতনু তলিয়ে গেল অনেক নিচে। সেখান থেকে তাকে টেনে তোলবার কোন উপায় আর নেই।

আজকাল অনুরূপার কাছে যখন তখন সে আসে। আসে শুধু টাকাব প্রয়োজনে। কখনও পায় কখনও পায় না। টাকা পাওয়াটা যেন তার দাবি হয়ে দঁড়িয়েছে। দিন দিন সে সহ্যের বাইরে এসে উপস্থিত হয়েছে। অতনু কি ভেবেছে অনুরূপাকে মূলধন করে সে বাঁচবে? না, তা হবে না। কিছুতেই হবে না। নিজেব প্রশ্নেব উত্তবে নিজেব মাথা নাড়ে অনুরূপা।

॥ উনিশ ॥

স্বামীর সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়ে তবুও একরকমভাবে দিন কাটছিল জয়ার। শ্বশুরের সেবার মাঝে সে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিল। সেই বৃদ্ধের স্নেহ আর ভালবাসাই ছিল তার নিঃসঙ্গ জীবনের পাথেয়। আজ তার ভিতটাও টলমল করছে।

অজিতপ্রসাদের বেশ ভালরকম মাথার বিকৃতি ঘটেছে। ডাক্তার দীনদয়াল অনেক চেষ্টা করেছেন। মানসিক রোগের বড় বড় ডাক্তার এসেছিলেন। তাদের কারও চেষ্টা ফলবতী হয়নি। দিন দিন অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছেন অজিতপ্রসাদ। মাথার চুল রুক্ষ। পরনের কাপড়জামাও অপরিচ্ছন্ন। দৃষ্টিতে কোন সহজতা নেই। সকাল আর রাত্রের খাবার যেমন দেওয়া হয় তেমনই পড়ে থাকে। একটু আধটু খেয়ে বাকিটা ছড়িয়ে ফেলে দেন।

দীনদয়াল প্রস্তাব করেছিলেন এই অবস্থায় বাড়িতে রাখলে চিকিৎসার সুবিধা হবে না। কোন মানসিক রোগের চিকিৎসালয়ে তাঁকে পাঠানো দরকার সে চেষ্টাও কয়েকবার করা হয়েছিল। অজিত-প্রসাদকে কিছুতেই হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারা যায়নি। রেগে বলেছিলেন : আমি যাব না। কোথায় যাব, কেন যাব ?

দীনদয়াল বলেছিলেন : নতুন একটা বাড়িতে কিছুদিন থাকবেন আপনি।

: না। চাই না আমি নতুন বাড়ি। এখান থেকে এক পা-ও আমি নড়ব না। তোমরা আমাকে কী পেয়েছ ?

এমনি ধরনের অনেক কথাবার্তা মাঝে মাঝে হতো। তারপর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আশা তারা ত্যাগ করেছিল। জয়ারও খুব ইচ্ছে ছিল না বৃদ্ধ হাসপাতালে যান। জীবনের যে কটা দিন তিনি আছেন সেই কটা দিন থাকুন তিনি তাঁর এই পৈত্রিক ভিটেতে। জয়া জানে বৃদ্ধ ভালবাসেন এ বাড়িব মাটিকে। এখান ছাড়া কোথাও তিনি থাকতে পারবেন না। আর কোথাও গেলে দম আটকে আসবে তাঁর। এখানেই তিনি শান্তিতে থাকুন। তাছাড়া তিনি চলে গেলে জয়াই বা কি নিয়ে থাকবে? দূরে পাঠিয়ে সেও তো অস্থির হবে সারাক্ষণ।

অতনু অনেকদিন আসেনি। জয়া তার আশাও ছেড়ে দিয়েছে। মাঝে মাঝে অজিতপ্রসাদ আপন খেয়ালে জয়াব ঘবে যান। খুব রেগে বলেন ঃ বল, সে কোথায়?

ঃ কার কথা জিজ্ঞাসা করছেন বাবা?

ঃ সেই কুলাঙ্গাবের কথা।

ঃ তিনি তো আসেন নি।

এ কথায় হেসে ওঠেন অজিতপ্রসাদ। বলেন ঃ কোথায় লুকিয়ে আছে বল। আমার কাছে গোপন কববাব চেষ্টা কবো না।

ঃ এ আপনি কী বলছেন বাবা?

ঃ আমি জানি তুমি তাকে লুকিয়ে রেখেছ।

শ্বশুরের মূর্তি দেখে ভয় হয় জয়াব। কী ভয়ানক দুঃখ আছে ভবিষ্যতের গর্ভে সেই কথা সে ভাবে।

এক দিন ডাক্তার দীনদয়ালকে ডেকে পাঠাল জয়া। অবস্থা ক্রমশই খারাপ হচ্ছে। সব কিছু তাঁকে বলে সে জিজ্ঞাসা কবে ঃ ডাক্তারবাবু, বাবাকে কি ভাল করে তোলার কোন উপায়ই নেই?

ঃ আমাদের ডাক্তারী শাস্ত্রে যতদূর সম্ভব করেছি। মর্ফিয়া দিয়ে ঘুম

পাড়িয়ে সাময়িকভাবে শান্তও করেছি। অসুখটা মনের। বেশী ওষুধ খাওয়ানোটা ভালও নয়।

জয়া বলে : দিন দিন রাগটাও যেন বেড়ে যাচ্ছে। আগে বাবা আমাকে কোনদিন বকেননি। আজকাল কথায় কথায় আমার ওপরও রেগে যাচ্ছেন।

দীনদয়াল ব -লেন : কিছুদিন বাইরে কোথাও নিয়ে যেতে পারলে মনে হয় ভাল ফল পাওয়া যেত।

: বাইবে অনেক চেষ্টা করেও নিয়ে যাওয়া গেল না, সে কথা তো আপনি জানেন। এই বাড়ি আব ওই ঘব ছেড়ে কোথাও ওঁকে নড়ানো যাবে না।

দীনদয়াল বহুদিন এ বাডিব গৃহচিকিৎসক। এই বংশের সব ইতিহাস তিনি জানেন। মল্লিক পবিবাবেব উত্থানেব কথা তিনি শুনেছেন অজিত-প্রসাদেব কাছে। পতনেব ছবি দেখছেন দীর্ঘ বিশবছব ধরে। অজিত-প্রসাদেব স্ত্রীর চিকিৎসা কবতে এ বাডিতে এসেছিলেন কুড়ি বছর আগে। মাবাত্মক বকমেব টাইফয়েড হয়েছিল জমিদাব-গৃহিণীর। সে সময়ে দীনদয়াল তাঁর সিনিযব ডাক্তাব লাহিড়ীব সঙ্গে আসতেন এখানে। স্ত্রীকে ভাল কবে তুলতে প্রচুর টাকা খবচ করেছিলেন অজিতপ্রসাদ। দীনদয়াল তখন অল্পদিন ডাক্তারি শুরু করেছেন। অল্পদিনেই সুচিকিৎসার জন্যে নাম কবেছিলেন। ডাক্তার লাহিড়ী এবং দীনদয়াল আপ্রাণ চেষ্টা কবেছিলেন জমিদার-গৃহিণীকে সাবিয়ে তুলতে। কিন্তু ব্যর্থ হলেন তাঁবা।

অজিতপ্রসাদ ডাক্তাব দীনদযালেব ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছিলেন। একটা বন্ধুত্বেব সম্পর্ক গড়ে ওঠে দুজনেব মধ্যে। সেই থেকে দীনদয়াল তাঁদের পরিবারের বাঁধা ডাক্তাব। পেশাব বাইরেও একটা আত্মীয়তার ভাব ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয়। অজিতপ্রসাদ বয়সে তাঁর "চেয়ে দশ বছর বড়। দাদাব মতো দেখতেন তাঁকে। অতনুকেও দীনদয়াল খুব স্নেহের চোখে

দেখতেন। অতনুর মা যখন মারা যায় তখন সে দশবছরের ছেলে। স্বাস্থ্যবান সুন্দর এক বালক। দীনদয়ালও মনে মনে দুঃখ অনুভব করেন অতনুর জন্যে। জয়ার কথাও ভাবেন তিনি। অজান্তে কখন এই সংসারের সুখ দুঃখের সঙ্গে নিজের অনুভূতিকে মিশিয়ে ফেলেছেন জানতে পারেন নি। তাই আজকের অজিতপ্রসাদকে দেখে মনে মনে বেদনা অনুভব করেন তিনি।

জয়াকে উপদেশ দেন দীনদয়াল: ওর কোন কথার প্রতিবাদ করবে না। কোন ইচ্ছেকে কখনও বাধা দেবে না। সব সময়ে মনে আনন্দ দেবার চেষ্টা করো। এইভাবে আশা করছি কিছু ভাল ফল পাওয়া যাবে। মাথা নেড়ে জয়া তাঁর কথাগুলো মনে রাখবে বলে সম্মতি জানায়।

জয়ার কাছ থেকে উঠে অজিতপ্রসাদের সঙ্গে দীনদয়াল দেখা করতে যান। তাঁকে দেখে অজিতপ্রসাদ প্রথমে বেশ ভালভাবেই কথা বলেন। তাঁর মাথার গোলমাল মোটেই বোঝা যায় না। শেষে এক সময়ে অন্যমনস্ক হয়ে যান। বলেন: ডাক্তার, পালিয়ে যাও, পালিয়ে যাও এখান থেকে। পুলিস আসছে।

পথের দিকে চেয়ে থাকেন অজিতপ্রসাদ। কথা না বাড়িয়ে দীনদয়াল বিদায় নেন।

জয়া অপেক্ষা করে। অতনুর ফেরবার অপেক্ষা করে। অজিতপ্রসাদের সুস্থতার জন্যে অপেক্ষা করে। কিন্তু দিন কেটে যায়। মনের কোন আশাই পূর্ণ হয় না। চেষ্টা করে প্রাণঢালা সেবা দিয়ে শ্বশুরকে সন্তুষ্ট করতে।

একদিন রাত্রে দুধের পাত্রটা হাতে নিয়ে জয়া অজিতপ্রসাদের ঘরে ঢোকে। স্ত্রীর ছবিখানার দিকে তাকিয়ে আপন খেয়ালে তিনি বলেন: আমি জানি সে আর আসবে না।

পিছনে দাঁড়িয়ে জয়া বলে ঃ বাবা।

ঃ বৌমা। আমার যে সব গোলমাল হয়ে গেল।

ঃ দুধটা খেয়ে শুয়ে পড়ুন বাবা।

হো হো করে হেসে ওঠেন অজিতপ্রসাদ। বলেন ঃ আচ্ছা বৌমা, বলত আমি রাজা কি না!

ঃ হ্যাঁ, আপনি রাজা।

আরও হাসেন তিনি। বলেন ঃ আমার রাজসিংহাসন কোথায়? কোথায় আমার মন্ত্রী অমাত্য।

জয়া খুব শান্তভাবে বলে ঃ তারা সব ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঃ কেন ঘুমুবে? আমি জেগে রইছি আর তারা ঘুমিয়ে পড়েছে!

আর কোন কথা বাড়াতে চায় না জয়া। কাছে এসে বলে ঃ আপনি এটা খেয়ে নিন।

ঃ ওটা কি? প্রশ্ন করেন অজিতপ্রসাদ।

ঃ গরম দুধ।

ঃ আমি খাব না। আমাকে জল দাও। শুধু ঠাণ্ডা জল। আমি আর গরম সহ্য করতে পারছি না। আমাকে ঠাণ্ডা হতে দাও।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে জয়া। কি আর বলবে সে। দিনের পর দিন এই একই দৃশ্য। কিছুতেই সে ভোলাতে পারে না বৃদ্ধকে। তবুও চেষ্টা করে। একটুও বিরক্তি নেই তার মুখে। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে তার হাত দুটি ধরে অজিতপ্রসাদ বলেন ঃ বৌমা, আমাকে এমন দেশে নিয়ে যেতে পার যেখানে বারোমাস শুধু বৃষ্টি। যেখানে সূর্য ওঠে না এমন জায়গায় নিয়ে যেতে পার?

ঃ আচ্ছা নিয়ে যাব।

অজিতপ্রসাদ তার হাত ছেড়ে পেছিয়ে আসেন। সোফার ওপর বসে বলেন ঃ বুঝতে পেরেছি তুমি ভয় পেয়েছ।

আবার অট্টহাসিতে ভরিয়ে তোলেন ঘরখানা।

ডাক্তার দীনদয়ালকে জয়া পরের দিন সব কথা বলে। তিনিও আশা এক রকম ছেড়ে দিয়েছেন। ডাক্তার বটব্যালের কাছে ওষুধ আনা হয়। প্রায় সময়ই অজিতপ্রসাদ ওষুধ ছুঁড়ে ফেলে দেন। বলেন : বিষ। আমি জানি আমাকে বিষ খাওয়াতে চাইছ।

জয়া নিজের ঘরে ফিরে এসে কাঁদে। আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছেন অজিতপ্রসাদ। তাঁর এ উক্তি নিঃসন্দেহে বাতুলের প্রলাপ। কিন্তু বিশ্ব-সংসারের ওপর কতখানি বিতৃষ্ণা আর অবিশ্বাস মনের মাঝে জমা হলে অবচেতন মুহূর্তে অপ্রকৃতিস্থ মনে এই কথা জাগে।

জয়ার ঘরে এসে অজিতপ্রসাদ খুব রেগে জিজ্ঞাসা করেন : আমি জানতে চাই কেন তোমরা আমাকে বেঁধে রেখেছ ?

: আপনি এ কি বলছেন বাবা। কোথায় আপনার বাঁধন ?

: সংসারের বাঁধন। স্নেহ আর মায়ার বাঁধন। আমি জানতে চাই কেন তোমরা আমাকে ধরে রেখেছ ? শুনতে চাই আমি কে ?

উত্তেজিত শ্বশুরকে কি বলে বোঝাবে জয়া ভেবে পায় না। তাঁকে শান্ত করবার জন্যে কাছে গিয়ে বলে আপনি নবাবপুরের জমিদার।

একথায় আরও উত্তেজিত হয়ে পড়েন বৃদ্ধ। দূরে একটা আয়নার সামনে চলে যান। নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন আয়নার মধ্যে। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে বলেন : কে বললে আমি জমিদার। জমিদার মরে গেছে, মরে গেছে। অনেকদিন আগে সে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এখন আছে শুধু তার কঙ্কাল।

জয়া ব্যথা পায়, ভয় লাগে তার। তার অবলম্বনের ভিতটায় বড় রকমের ফাটল ধরেছে। নরম হয়ে গেছে তার পায়ের নিচের মাটি। এই রহস্যপুরী তিনমহলা প্রাসাদটায় দুটি প্রাণী তারা ছিল। একজন আর একজনের দুঃখ সুখের সাথী। একজন জীবন সায়াহ্নে উপনীত বৃদ্ধ। একটি বাগ্দত্তা মেয়ের ভক্তির দেবতা। আর একজন পূর্ণযৌবনা কুলবধূ। একটি বৃদ্ধের স্নেহের পুত্তলি। সেই সংযোগ আজ বিচ্ছিন্ন।

ভেঙে গেছে, সেই সেতু। একটা বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যে থেকেও দুজনে আজ আলাদা। বৃদ্ধ আজ ভাবেন না ব্যথিতা বঞ্চিতা জয়ার কথা। জয়া অনেক চেষ্টা করেও উন্মাদ অশান্ত মানুষটাকে শান্ত করতে পারে না।

অনেকদিন আগে থেকে তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে চলেছে এই জমিদার বংশ। বেঁচে আছে শুধু হারানো দিনের ঐতিহ্য আর আভিজাত্য নিয়ে। এই প্রাসাদপুরীর জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্কে জয়ার আবির্ভাব। নাটকের যেখানে শুধু করুণ মূর্ছনা সেখানেই তার আসা-যাওয়া।
শ্বশুরের কথায় আহত হয়ে বলে : ও কথা বলবেন না বাবা। আপনি আমার আশা ভরসা! আপনার মুখ থেকে আমি এমন কথা শুনতে পারছি না।
আবেগে জয়া অজিতপ্রসাদের হাত দুটি ধরে মিনতি জানিয়েছিল। সে বোধ হয় ভুলে গিয়েছিল যাঁর সঙ্গে কথা বলছে তিনি এক অন্য জগতের মানুষ। এই সংসারের দুঃখ বেদনা আশা নিরাশার কোন ধার ধারেন না তিনি। তাঁর বিচারবুদ্ধি আজ লুপ্ত, অনুভূতি অস্পষ্ট, চিন্তাসূত্রের কোন পারম্পর্য নেই। জয়ার কথা তাই বৃদ্ধের মনে কোন রেখাপাত করেনি।
তাঁর নিষ্প্রভ চোখ অন্যের মনের চেহারা দেখবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে।
অজিতপ্রসাদ বললেন : তবে আমি কি বলব? আমি কি বলব আমি বাহাদুর শা, আমি নবাব সিরাজউদ্দৌলা, আমি জগৎ শেঠ?
জয়া আর কোন কথা বলে না। অজিতপ্রসাদও নির্বাক হয়ে পায়চারি করতে থাকেন। তারপর আবার কাছে এসে বলেন : বলতে পারলে না তো আমি কে? ভাল করে ভেবে বল আমি কে? আমার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখ তো।

তারপর ভাবতে ভাবতে বলে ওঠেন : সেই শয়তান এসেছে। আমি ওকে শাস্তি দেব। কঠিন শাস্তি দেব।
ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যান অজিতপ্রসাদ।

জয়া পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর শ্বশুরের ঘরের দিকে এগয়। সেখানে গিয়ে দেখে খুব পুবান মবচে ধরা একটা বন্দুক নিয়ে অজিতপ্রসাদ গুলি করার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। সামনে মায়ের কোলে অতনুর একটা ছবি।
: বাবা। ধীর ভাবে জয়া বলে।
: কে? চিৎকার করে ওঠেন বৃদ্ধ।
ফিরে দাঁড়িয়ে তাকে দেখে হাত থেকে ফেলে দেন বন্দুকটা। তাঁর কণ্ঠে তখন আবার সেই আগের স্নেহের সুর।
: বৌমা। তোমার চোখে জল কেন বৌমা?
: বাবা।
আর কোন কথা বলতে পারে না জয়া। অজিতপ্রসাদ আরও কাছে এসে বলেন : বৌমা, আমার মাথাটা কেমন যেন ঘুরছে। ঘুম পাড়িয়ে দেবার কোন ওষুধ তোমার জানা আছে? আমাকে একটু ঘুম পাড়িয়ে দিতে পার?
কোনো কথা না বলে বৃদ্ধের হাত ধরে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে আসে জয়া। খাটের ওপর শুইয়ে দেয় তাঁকে। মাথার কাছে বসে তাঁর শুভ্র চুলগুলোর জট ছাড়াতে থাকে। ভাবে নিজের কথা। বৃদ্ধের কথাও ভাবে। অতনু তো তার তিন বছরের সঙ্গী। অজিতপ্রসাদ তাকে কোলে পিঠে করে তিরিশ বছর কাটিয়েছেন। তার দুঃখ স্বামীর জন্যে। কিন্তু সন্তানের জন্যে পুত্রবৎসল বাপের বেদনা কি তার চেয়ে কোন অংশে কম। এই শক্তিশেল বুকে নিয়ে আজও যে তিনি বেঁচে আছেন সেইটাই আশ্চর্য।

॥ কুড়ি ॥

অনুরূপা বুঝেছে শুধু টাকা মানুষকে শান্তি দিতে পাবে না। কাজ আর টাকাব ওপব বিতৃষ্ণা এসে গেছে তাব। হাতের টাকা যতক্ষণ খরচ করতে না পারে ততক্ষণ ছটফট কবে সে। আজকাল দান করার নেশা এসেছে তাব। যে কোন ব্যাপাবে সাহায্য চেয়ে কেউ বিফল হয় না। বন্যা, দাঙ্গা বা জনহিতকব কোন কিছুতে সাধ্যমত সাহায্য করে থাকে সে। এমনিভাবে টাকাব সদ্ব্যয় কবে আনন্দ পায় মনে।

অনুরূপাব মনটা আজকাল খুবই খাবাপ। অনেকদিন আগেই সে জেনেছিল তাব মা আব অরূপ পলাশডাঙ্গাতে মামার কাছে আশ্রয় নিয়েছে। লোক পাঠিয়েছিল সে। সংবাদ পেয়েছে তারা আসবে না। ভেবেছিল দুদিন পবে তাদের বাগ কমবে। ফিবে আসবে তারা। এও জানত, মামা সনাতন ঘোব সংসাবী। এমন কিছু সচ্ছল অবস্থা তার নয়। বেশীদিন ভরণপোষণেব খবচ চালাতে পারবে না সে। তাকেও একদিন আসতে হবে অনুরূপাব কাছে। অনুরূপা পাপ করেনি। সমাজ থেকে দূরে তাব থাকবাব কথা নয়। আর গোঁড়ামি নিয়ে তারাই বা কতদিন অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করবে ?
কিন্তু মনের আশাতরু মনেই শুকিয়ে যায়। কেউ এল না তার কাছে। কেউ তাকে ডাকল না। গোপনে সে তাদের সংবাদ নিত মাঝে মাঝে। তারপর একদিন মনিঅর্ডার করে বেশ কিছু টাকা সে পাঠায় সনাতনের নামে। কুপনে লিখে দেয় অরূপের পড়াশুনার জন্যে এ টাকা পাঠানো

হল। প্রতি মাসেই সে পাঠাবে। প্রকারান্তরে করুণা ও সনাতনকে সাহায্য করবার একটা চেষ্টা সেটা।

সেই টাকা ফিরে এল। সনাতন তা নেয়নি। প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিল অনুরূপা। পরে লোকমুখে সে আরও শুনেছে সনাতনের স্ত্রী যথেচ্ছ ভাষায় গাল দিয়েছে অনুরূপাকে। সনাতন বলেছে, তার টাকা না হলেও অরূপের পড়াশুনার কিছুমাত্র অসুবিধা হবে না। তার টাকায় অরূপের ভবিষ্যৎ না গড়াই ভাল।

এর পরে আর কোন চেষ্টা করেনি তাদের সাহায্য করতে। মনের বেদনা তার মনেই জমা থাকে। সে প্রতিজ্ঞা করেছে আর কোন সংযোগ রাখবে না তাদেব সঙ্গে। যারা তাকে চায় না, যারা তার টাকাকে ঘৃণা করে তাদের কথা মনে এনে লাভ কি?

কিন্তু ভুলে যেতেও তো পারছে না। মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারে না তাদের স্মৃতি।

অরূপেব মতো কোন ছেলেকে রাস্তায় দেখলে কথা বলতে ইচ্ছে হয় তার সঙ্গে। করুণার মতো কাউকে দেখলে আলাপ করতে তার মন চায়। অতনু জানে এসব দুর্বলতার কথা। জানে অনুরূপা দান করে করে নিঃশেষ করে দেয় তার সব টাকা। রাগে জ্বলতে থাকে সে। মাঝে মাঝে ঝগড়াও হয় তার সঙ্গে। একদিন অতনু স্পষ্টই বলে: আমি চাই না এমনভাবে পথে পথে তুমি ঘুরে বেড়াও।

: তোমার চাওয়া না চাওয়া আমি গ্রাহ্য করি না।

সেকথা শোনার পর অতনু বলে: আর এমনিভাবে টাকাগুলো বিলিয়ে দিচ্ছ নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটু ভাববার দরকার নেই কি?

: তুমি তোমার ভবিষ্যৎ ভাব অতনু। আমাকে পরামর্শ না দিলেই খুশী হব।

: তোমার ওপর আমার একটা দায়িত্ব আছে সেইজন্যেই এত কথা বলছি।

অনুরূপার রাগ হয়ে যায় সে কথা শুনে। একটা যাযাবর উচ্ছৃঙ্খল মানুষের মুখে দায়িত্বের কথাটা সে সহ্য করতে পারে না।

ঃ দায়িত্ব আছে বলেই জোর করে জুলুম করে গভীর রাত্রেও তুমি আমার কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যাও। দায়িত্ব আছে বলে দিনের পর দিন তুমি পাপের পথে আমাকে ঠেলে দিতে চাও। তোমার লজ্জা করে না একথা বলতে?

ঃ লজ্জা জিনিসটা অনেক দিন আগেই আমি গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েছি।

সেদিন আর কিছু না বলে চলে যায় অতনু। অনুরূপা আজকাল কিছুতেই আর সহ্য করতে পাবে না তাকে। এতদিন অতনুর মনে শুধু একটা খারাপ উদ্দেশ্যই কাজ করেছে। অনুরূপার দ্বারা টাকা উপায় করিয়ে সেই টাকায় নিজের ভোগবিলাস চরিতার্থ করতে চায় সে। একথা হাড়ে হাড়ে অনুরূপা বুঝেছে। আজকাল অতনুকে দেখলে চিন্তা জাগে তার মনে। ভাবে আবার কোন্ নতুন বিপদ সে ডেকে আনছে। আবার কোন্ ফন্দি কোন্ অভিসন্ধি বা প্ররোচনা এসেছে তার মাথায়। অতনু বুঝি ভাবে সে চালক। যেমনভাবে চালাবে অনুরূপা তেমনি-ভাবেই চলবে।

এ ছাড়াও আছে আর এক জ্বালা। অতনু যে রাজাবাহাদুরকে সঙ্গে নিয়ে এক সন্ধ্যায় এসেছিল তিনি অনুরূপাকে বিবাহের প্রস্তাব জানিয়েছেন। শুনে হাসি পেয়েছে তার। সারা জীবন ধরে এই একই যন্ত্রণা। যেখানে যাবে সেই একই আমন্ত্রণ। সে আমন্ত্রণের মাঝে আছে শুধু ক্ষণিকের মোহ। শুধু দেহের ক্ষুধা সেখানে। অনুরূপা জানে মনের দিক থেকে তারা কেউ উঁচু নয়। একটা অদম্য পাশবিক জৈবিক আকর্ষণ তাদের টেনে নিয়ে আসছে। সেখানে বয়সের কোন তারতম্য নেই। অবস্থার কোন ভেদাভেদ নেই। সেখানে মানুষ

একই প্রবৃত্তির দাস। এই প্রবৃত্তির কাছে কোন তফাত নেই ত্রৈলোক্য তালুকদার আর রাজাবাহাদুরের মাঝে।
অনুরূপা এও জানে, একদিন মোহ ঘুচে যাবে। রূপের আকর্ষণটা ঝিকে হয়ে আসবে অতিবৃদ্ধ পৃথিবীর কালক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে। অনেক দূরের দুরধিগম্য দেহটাকে নিয়ত কাছে পেয়ে সব ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে তাদের। তখন আর কোন দাম থাকবে না অনুরূপার। রক্তমাংসের ওই দেহটার বাইরে তার যে সত্তা যে মন যে প্রাণ রয়েছে সেগুলো সবই হয়ে যাবে গৌণ ওই দেহসর্বস্ব মানুষগুলোব কাছে। আকর্ষণ থেকে যেখানে ভালবাসার জন্ম, পাশবিক কামনার টানে যেখানে মিলনের আকুতি তা ক্ষণস্থায়ী। তা সুস্থ সংসারযাত্রার সহায়ক নয়। অনুরূপার ঘৃণা হয় ওদের কথা ভেবে। সে ভাবতে চায় না।

রেডিওটা খুলে দিয়ে ক্লান্ত দেহটাকে এলিয়ে দেয় সে খাটের ওপর। যুধিষ্ঠির এসে বলে : দিদিমণি, ঠাকুরকে খাবার দিতে বলব ?
: না। আমি কিছু খাব না।
মাথা চুলকে যুধিষ্ঠির বলে : আজ তো কোথাও বেরননি। না খেয়ে উপোস করে থাকলে শরীর খারাপ হবে যে।
অনুরূপা রেগে ওঠে। বলে : তোরা কি বাড়িসুদ্ধ লোক আমাকে শাসন করবি ? একবার বলেছি খাব না। বেরিয়ে যা আমার চোখের সামনে থেকে।
যুধিষ্ঠির চলে আসে। উঠে রেডিওটা বন্ধ করে দেয় অনুরূপা। রাত্রি এগারটা বাজার সময়-সঙ্কেত। আবহাওয়ার খবর বলে তৃতীয় অধিবেশন শেষ হল। ঠিক সেই সময়ে অতনু আসে। প্রচুর নেশা করেছে সে। জামাকাপড়গুলোও যথেষ্ট অপরিচ্ছন্ন। দাড়ি কামায় নি কয়েকদিন। অতনুর এরকম চেহারা কখনও আগে দেখা যায় নি। অনুরূপা আশ্চর্য হয় তাকে দেখে। জিজ্ঞাসা করে : তোমার মূর্তি আজ এরকম কেন ?

ঃ আমার ভয়ানক বিপদ।

বিদ্রূপের সুরে অনুরূপা বলেঃ বিপদ দেখে তুমি তো কোনদিন ভয় কর না।

ঃ ভয় করি না ঠিকই। তবে এটা একটা অন্যরকম ব্যাপার।

ঃ তোমাদের অতশত ব্যাপার আমার জানবার দরকার নেই। অনুরোধ করছি এ অবস্থায় তুমি এখানে এস না।

জড়িত গলায় অতনু বলেঃ আমি কিন্তু তোমার মুখ থেকে এটা আশা করি নি।

ঃ তুমি কি ভেবেছ তোমাব সব অবস্থাতেই আমি তোমায় মাথায় নিয়ে নাচব?

ঃ সেকথা বলছি না। আজ তোমার এত ক্ষমতা তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাও।

অনুরূপা বলেঃ আমাকে ভুল বুঝ না অতনু। তুমি হয়ত আমাকে অনেক অকথ্য শোনাবে। আমার পেশা নিয়ে আমার সতীত্বের প্রশ্ন নিয়ে অনেক কথা বলবে। আরও বলবে এখানে তোমার প্রবেশের অধিকার আছে। কিন্তু ভুলে যাচ্ছ কেন আমাকে তুমি যা-ই বল না কেন আমার এই গণ্ডীর ভেতরে আমার ঝি-চাকরদের কাছে আমার একটা সম্মান আছে। বাড়ির বাইরে তুমি আমার সামনে আরও মাতাল হয়ে এস। কিন্তু এদের সামনে আমার সম্মান রাখতে দাও। এইটুকুই আমার অনুরোধ।

অতনু বললেঃ ধন্যবাদ। এতদিনে বুঝতে পারলাম সত্যিই তুমি ভাল অভিনয় কর।

ঃ অতনু!

কঠোর গলায় অনুরূপা শাসন করে তাকে।

একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে অতনু হাত জোড় করেঃ মাফ চাইছি। সেকথা যাক। রাজাবাহাদুরকে কি জবাব দিলে?

দাঁতে দাঁতে চেপে অনুরূপা বলে ঃ জবাব দেবার দরকার মনে করি না। এসব তোমার কারসাজি।

ঃ অসময়ে যদি কিছু ঘটকবিদায় পাই তাতে আমার অপরাধটা কোথায় ?

রেগে অনুরূপা বলে ঃ একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এত রাতে কোনো গোলমাল নিশ্চয়ই চাও না।

অতনু চিবিয়ে চিবিয়ে বললে ঃ আমাব তাতে কোন আপত্তি নেই। তবে ওই যে একটু আগে সম্মান না কি একটা বললে, তোমার সেইটাই একটু মানে ইয়ে হবে।

রাতের স্তব্ধতা ভেঙে বিকট হেসে ওঠে অতনু। খুব খাবাপ লাগে অনুরূপার। কোন কথা না বলে অতনু চলে যায়। দবজাটা বন্ধ করে পাখাটা খুলে শুয়ে পড়ে অনুরূপা।

ঘুম আসে না তার চোখে। এত অশান্তিব মাঝে ঘুম আসবে না। এই সব উৎপাত আর অশান্তির কথা ভাবতে ভাবতে কেটে যাবে সারা রাত। অতনু বোধ হয় বুঝেছে অনুরূপা তাকে ঘৃণা করে। নইলে আজ টাকা চাইল না। বিপদের কথাই শুধু বললে। কি বিপদ তা প্রকাশ করল না। শুনেও কাজ নেই অনুরূপার। এই পবিবেশ, এই আড়ম্বর, এই ঐশ্বর্য তাব অসহ্য হয়ে উঠেছে। এক অশান্তিব আগুন জ্বেলে দিয়েছে তার মনে। সে এসব কিছুই চায না। পেছনে ফেলে আশা দিনগুলোর কথা সে ভাবে। কবির কথায় মন শুধু বলতে চায 'দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগব।'

বামলালেব কারবারে মস্ত বড় একটা ওলোট-পালট হয়ে গেছে। অতনুর বিপদ সত্যিই। কিছুদিন আগে অতনু সাহেবগঞ্জ গিয়েছিল একটা আফিমেব চালান আনতে। সেখানে অপ্রত্যাশিতভাবে পুলিসের হাতে ধবা পড়ে সে। কুড়ি হাজাব টাকার মতো মাল কেনারাম তার হাতে তুলে দিযেছিল। তাবপব কেনারাম গা ঢাকা দেয়। সেই মাল নিয়ে সাহেবগঞ্জ থেকে আসাব পথে গোয়েন্দা পুলিস তাকে ধরে। সঙ্গে ছিল আবগাবী বিভাগেব লোকজন। সমস্ত মাল আটক করে তাবা। অতনু কোনবকমে পালিযে আসে নিজের বুদ্ধি-কৌশলে।

কলকাতায় ফিবে রামলালকে সব কথা জানায়। শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে বামলাল। একদমে এতগুলো টাকা চলে যাওয়ায় খুব মুষড়ে পড়ে সে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অগ্রপশ্চাৎ সব ভেবে মাল খোওয়া যাওয়াটা মন থেকে বিশ্বাস করতে পারে না। অতনু পাকা লোক। অনেকদিন ধবে সে তাকে সাহায্য করছে। এর চেয়ে আরও কঠিন কাজ সে সহজে সমাধা করেছে। এই সামান্য ব্যাপারটা কৌশলে মিটমাট করা তার উচিত ছিল। এই টাকার জন্যে দায়ী অতনু। কেনারাম সত্যিই বিশ্বাসী লোক। তার কাজ সে করেছে !

রামলালেব সন্দেহটা অতনু বুঝতে পেরেছিল। বুঝে তার ওপর ঘৃণা হয়েছিল তার। রামলাল এত নীচ ! অতনুর কথা এমনিভাবে অবিশ্বাস

করবে ভেবে পায়নি সে। অতনু তাকে বুঝিয়েছে, পরিস্থিতি যা দেখা দিয়েছিল মাল ছেড়ে কৌশলে তার পালিয়ে আসা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। যদি টাকার মায়া করে সে পালিয়ে না আসত তাহলে রামলালও বাদ যেত না। দলবল সমেত সে ধরা পড়ত।

কিন্তু বিশ্বাস যখন ভেঙে যায় মন থেকে মানুষ কোন কিছুই মানতে চায় না। রামলালও মানতে চায়নি। সে ধরে নিয়েছে এটা অতনুরই একটা চাল।

ওদিকে কেনারাম এই চালানটায় তার নিজের ভাগ বাবত আড়াই হাজার টাকা দাবি করে। রামলাল বলে তার এত লোকসানের ওপরে এক পয়সাও সে দেবে না। ভাগের টাকার জন্যে দায়ী অতনু।

কেনারাম অতনুর কাছে টাকা চায়।

অতনু কোথায় পাবে? আজ সে রাজা, কাল ফকির। সঞ্চয় নেই এক কপর্দক। রামলালের কাছে কাজ করে। যা পায় ফুর্তি করে, মদ খেয়ে, রেস খেলে উড়িয়ে দেয়। সে বলে কাজ রামলালের। টাকার দায়িত্বও তার।

কেনারাম বলে রামলালকে সে জানে না। সে অতনুর হাতে মাল দিয়েছে। তা যদি খোওয়া গিয়ে থাকে, অতনুই কেনারামকে টাকা দেবে। ছাড়বার পাত্র সে নয়।

অতনু জানত কেনারাম ছাড়বার পাত্র নয়। টাকা তাকে দিতেই হবে। কেনারাম সাংঘাতিক লোক। অতনুর চেয়েও দুঃসাহসী আর ভয়ঙ্কর। তাকে চটিয়ে লাভ নেই। এটাও সে বোঝে কেনারামকে টাকা না দিলে তারও পুলিসের হাত থেকে নিস্তার নেই।

রামলাল টাকা দেওয়ার ব্যাপারে শেষ কথা বলে দেওয়ার পরও অতনু

একদিন সকালে তার বাড়িতে যায়। তখন বজ্রপানিও সেখানে বসেছিল।

অতনু বলে : আর ছেলেমানুষি করো না রামলাল। আড়াই হাজার টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা কর।

: আমার এত টাকা তুমি লোকসান করলে। আমার মাথার ঠিক নেই। আমি ভাই ও টাকা দিতে পারব না।

অতনু চিন্তিতভাবে বলে : বুঝতে পারছি একাজ কেনারামেরই। পুলিসের কাছে ধরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তাকেই আমার সন্দেহ। সাংঘাতিক লোক সে। তার উপরে এই টাকা দাবি করছে এবং এও জানি, না পেলে আমার পক্ষেও চলাফেরা করা মোটেই নিরাপদ হবে না। সে রকম আভাস আমি পেয়েছি।

রামলাল এসব কথা একটুও শোনে না। খাতাপত্র দেখতে ব্যস্ত থাকে সে। বজ্রপানিও কোন কিছু উচ্চারণ করে না। জবাব না পেয়ে অতনু বলে : তাহলে কেনারামকে তুমি বুঝিয়ে বল।

রামলাল বলে : আমার কি দরকার। তোমরা দুজনে বোঝ। তোমার জন্যে আমার এই সর্বনাশ হল। তার ওপরে কেনারামের সঙ্গে আমি আবার চটাচটি করব !

: কারবারে লাভ-লোকসান আছে রামলাল। একথা তোমার আগে বোঝা উচিত ছিল।

: শুনে রাখ অতনু, রামলাল লাভটাই বোঝে। লোকসান দিতে শেখেনি।

: আচ্ছা চলি।

অতনু ফিরে যায়।

বজ্রপানি একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে : ব্যাপারটা এমনই রহস্যজনক কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

রামলাল মুখ তুলে বলে : ঠিক বোঝা যাচ্ছে। হয়ত দুজনেরই যোগ আছে এর ভেতরে।

: আমার কিন্তু অতনুর ওপর বিশ্বাস আছে।
রামলাল জোর দিয়ে বলে : আমি ওকে আর বিশ্বাস করতে পারি না।

বজ্রপানি তাদের এই মনান্তরটা ভাল চোখে দেখেনি। অতনু রামলালকে অনেক সাহায্য করেছে। যত টাকা লোকসানই হোক, আজকের এই আড়াই হাজার টাকাটাও রামলালের কাছে এমন কিছু নয়। তার জন্যে এই তিক্ততা না আনাই ভাল ছিল। রামলালকে বজ্রপানি বললে : তুমি পেট্রলের খনিতে বিস্ফোরক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ রামলাল। বিশ্বাস যদি ভেঙে যায়, অসন্তোষের আগুন জ্বলে উঠবে। হাজার চেষ্টা করেও সে আগুন নেভানো যাবে না।
রামলাল হাসে। হাসিতে তার শরীরটা নেচে ওঠে। বলে : আর ভয় পাই না। অতনু থাকল কি গেল তাতে আমার দুঃখ নেই। এখন রামলাল একটা ফিল্ম কোম্পানিব মালিক, পাঁচ সাতটা লিমিটেড কোম্পানির ডাইরেক্টর। বিশ পঁচিশটা ওয়েল-ফেয়ার সোসাইটির মেম্বার। রেড ক্রশ আর রিলিফেব চাঁদার খাতায় আমার নাম বড় করে লেখা হয়। রামলালের কথা শুনে বজ্রপানি হাসে।
: শুনে সুখী হলাম। তখ্‌তএ না বসে তুমি ছাড়বে না দেখছি।
তারপর বজ্রপানি উঠে আসে। চলে আসার সময়ে আবার সে রামলালকে বলেছিল অতনুব ব্যাপারটা ভেবে দেখতে।

রামলাল একটুও ভাবেনি তার কথা। টাকা সে দেবে না। আজ অতনু এই টাকা লোকসান করেছে। কাল যে এর চেয়ে বেশি করবে না তারই বা ঠিক কি? রামলাল দেখতে পাচ্ছে অতনু আজকাল অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। কোথায় সে থাকে, কি বলে তার কোনো স্থিরতা নেই। তাকে কোনো খবর দিতে গেলে খুঁজে পাওয়া যায় না। এলে বলে কলকাতার বাইরে ছিল। কিছুদিন আগে রামলাল তার শহরতলির

একটা বাগানবাড়িতে অতনুর থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। খুব নির্জন জায়গায় বাড়িটা। সেখানে কেউ নেই। একটা মালি আর অতনু। আজকে বেশ রেগেই অতনু চলে গেছে। রামলাল জানে না তার আশ্রয়ে আর সে থাকবে কিনা। না থাকে যাক তাব যেখানে খুশি। অবিশ্বাসী লোককে ধরে বাখতে চায় না সে।
অতনুকে বাদ দিয়ে কেনারামের সঙ্গে তাব কাজ কারবার চালু রাখতে হবে। এই কথাই ভেবে নিয়েছিল বামলাল।

পরের দিন অতনু আব রামলালের সঙ্গে দেখা করেনি। রামলাল খবর পেয়েছে আগের রাত্রে সে বাগানবাড়িতে ফেরে নি। অনুরূপার সঙ্গেও গত দুদিন সে সাক্ষাৎ করে নি। কোথায় গেল খবরও রাখার প্রয়োজন মনে কবে না কেউ।
সাবাদিন অফিসে কাজকর্ম দেখাশুনা করে রাত্রের দিকে বাড়ি ফেরে বামলাল। বাইরের ঘবে তখন কয়েকটি লোক অপেক্ষা করছিল। চাঁদা চাইতে এসেছিল দু-একজন। গো-হত্যা নিবাবণী সমিতি থেকে এসেছিল এক কর্মী। নাবীমঙ্গল সমিতিব সেক্রেটাবী এসেছিল বার্ষিক সাহায্যের কথা মনে করিয়ে দিতে। তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বেশ রাত হয়ে গেল।
উঠতে যাবে এমন সময়ে এল বজ্রপানি। তাকে দেখে রামলাল বলে ঃ এত বাত হল তোমার। আমি তো অফিসে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম।
ঃ কাজ তো একটা নয়। সব সাবতে দেরি হয়ে গেল। আমি ভাবছিলাম এসে দেখব তোমার নাক ডাকছে।

চেয়ারটা টেনে ভাল করে বসে বজ্রপানি। তারপর দুজনে কাজের কথা শুরু হয়। রামলাল একটা গাঁজা-আফিমের দোকান খুলতে চায়।

নিজস্ব একটা দোকান থাকলে চোরাই কাজকারবারের যথেষ্ট সুবিধা হবে। সেই উদ্দেশ্যে বজ্রপানি বেশ কয়েকদিন ঘোরাঘুরি করছিল। লাইসেন্সটা হাতে পাওয়া গেলে কারবার কাকে বলে রামলাল একবার দেখবে। সারাদিন ঘুরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে কাজের প্রায় বারো আনা সমাধা করে ফেলেছে বজ্রপানি। সেই কথাই জানাতে এসেছিল সে।

তার মুখে সব শুনে রামলাল বললেঃ সাবাস উকিলসাহাব। এখন দেখছি তুমি অতনুর চেয়েও ভাল কাজের লোক।

ঃ কার চেয়ে ভাল তা বলতে পারি না। তবে আমার আশা ছিল না এত তাড়াতাড়ি সফল হব।

রামলাল উৎসুক হয়ে বলেঃ যাক, কি কথা হল বল।

ঃ লাইসেন্সের ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে। যে ভদ্রলোক ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন তাঁর সঙ্গে কাল সন্ধ্যায় একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এলাম। সন্ধ্যা সাতটায় আমাদেব হাজিব থাকতে হবে ভিয়েনা হোটেলে। সেখানেই সব কথাবার্তা হবে।

রামলাল অধৈর্য। সে কথাবার্তা চায় না। শুধু কাজ চায়। বজ্রপানির মুখের দিকে তাকিয়ে বলেঃ কি বকম মনে হচ্ছে উকিলসাহাব?

ঃ মনে হয় আসছে সপ্তাহে লাইসেন্সটা পেয়ে যাব। তখন কিন্তু কথার নড়চড় করো না।

ঃ আরে না না। মাথা নাড়ে বামলাল।

বজ্রপানি সিগারেটে একটা টান দিয়ে হেসে বলেঃ এবারে কি নামে দেখা দেবে রামলাল?

ঃ কারবারের কথা বলছ? ওটা তো ফকিরচাঁদ ভাওয়ালকার নামে চলবে। তুমি তো সবই জান উকিলসাহাব।

রামলালের স্মিত হাসিটায় অদ্ভুত সারল্য। তা থেকে মানুষটার কথা একটুও বোঝা যায় না।

বজ্রপানি বলেঃ জানি তো সবই। তবে তোমার মুখ থেকে ওই নামটা শুনতে ইচ্ছে করছিল। সত্যিই তুমি বুদ্ধির বৃহস্পতি। তোমার কাছে আমরা কিছুই নয়।

বিনয়ে জিভ কাটে রামলাল। দুহাতে কানমলা খায় সে।

ঃ আরে এসব কথা কি বলছ? আমি বোকা।

এই কথা শুনে বজ্রপানির অতনুকে মনে পড়ে। বলেঃ মাঝে মাঝে বোকার মত্তোই কাজ করে ফেলছ। দলের মাঝে এমন বাধালে আমি ভাবছি তাই থেকে আবার পুলিসের সুনজরে পড়বে কোন্‌দিন। আর যাই কর শত্রু তৈরি করো না।

রামলালের যেমন টাকা বেড়েছে তেমনি বিশ্বাস বেড়েছে নিজের ওপর। কোনো কিছুতেই আর ভয় পায় না সে। বজ্রপানির আশঙ্কা শুনে সে বলেঃ ঘাবড়াও মাত উকিলসাহাব। আজ আমার ওপর সরকারের যা সন্দেহ তা লুটতরাজ রাহাজানির সন্দেহ নয়। তা হচ্ছে সরকাবের ইন্‌কাম-ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার সন্দেহ।

বজ্রপানি রামলালকে একটু তাতিয়ে দেবার জন্যে বললেঃ সেটাই বা থাকবে কেন?

মাথা নেড়ে বামলাল জবাব দেয়ঃ থাকবে না। সে ব্যবস্থা আমি করে ফেলব।

আরও কিছুক্ষণ দুজনে কথাবার্তা হল। বজ্রপানি যখন উঠল তখন রাত্ প্রায় বারোটা। উপবে উঠে রামলাল শুয়ে পড়ে। শুয়ে অনেক কাজের কথা ভাবে। ভাবে এবারে ছবির প্রযোজনা বন্ধ করে পরিবেশনের অফিস করতে হবে। তাতে লোকবলেরও দরকার নেই। ঝামেলাও অনেক কম। চোরাই কারবারের দিকে নজর একটু কমাতে হবে। আরও অন্যান্য কারবার খুলতে হবে। টাকা সে অনেক উপায় করেছে। এখন নামের মোহ তাকে পেয়ে বসেছে। টাকাও

চাই নামও চাই। এইসব ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল রামলাল।

রাত তখন প্রায় তিনটে। কেউ কোথাও জেগে নেই। শুধু রাস্তায় কয়েকটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করছিল। রামলালের ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে যায়। অন্ধকার ঘরে কার যেন পায়ের শব্দ শোনে সে। ভয়ে বুকটা তার শুকিয়ে গিয়েছিল। কোনরকমে সাহস সঞ্চয় করে বেড-সুইচটা টেপে। আলো জ্বলতে অবাক হয়ে রামলাল দেখে আলমারির চাবিটা হাতে অতনু দাঁড়িয়ে।
কিভাবে কেমন করে অতনু বাড়িতে ঢুকেছে ভেবে আশ্চর্য হয় রামলাল। গ্যারেজ ডিঙিয়ে ঘরের জানলার গরাদ বেঁকিয়ে ঢুকেছে সে। উদ্দেশ্য রামলালের টাকা চুরি করা। কেনারামের হাত থেকে বাঁচতে গেলে এ ছাড়া তার অন্য উপায় ছিল না। কেনারামকে কথা দিয়েছে যে কোন উপায়ে যেমন করে হোক তিনদিনের মধ্যে তার প্রাপ্য তাকে দেবে। এবার থেকে একটা নতুন চুক্তিতে তার সঙ্গেই সে কাজ করবে। রামলাল গভীর রাত্রে অতনুর এই রূপ দেখে ভীষণ ভয় পেয়েছিল। ভয়ে তার হাত পা কাঁপছিল। একবার ভাবে চিৎকার করে লোকজন জড়ো করবে। সঙ্গে সঙ্গে ভাবে, অতনু যদি তাকে প্রাণে মেরে ফেলে। তার চেয়ে একটা মীমাংসায় আসা ভাল। সে যা চায় তাই দিয়ে মিটিয়ে ফেলাই মঙ্গল।
রামলালের বিস্ময়ের ঘোরটা তখনও কাটেনি। আমতা আমতা করে বলে ঃ অতনু তুমি!
ঃ হ্যাঁ। আমি অতনু। চিনতে পেরেছ তা হলে।
অতনুর গলার স্বর শুনে রামলাল বুঝেছে বিপদ আসতে পারে। তাকে কোনদিন এত গম্ভীরভাবে কথা বলতে সে শোনেনি। আর অতনুর চোখে ছিল যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। রামলাল এতদিনের সাহচর্যে সে আগুনও

দেখেনি কখনও। তার জিভ তখন শুকিয়ে গেছে। কি কথা বলবে ভেবে পায় না। ভাঙা ভাঙা কথায় বলে: কিন্তু এত রাত্রে তুমি এইভাবে—

তাকে থামিয়ে অতনু বলে: অন্ধকার আমার কাছে আলো। তুমি তো জান, লোকে যখন ঘুমোয় তখনই শুরু হয় আমার কাজ আর আমার বাঁচবার রাস্তা।

ভয় পেয়ে রামলাল বলে: দুদিন ধরে কোথায় ছিলে তুমি? তুমি টাকা চেয়ে সেদিন রাগ করে চলে গেলে—

: তোমার আজকের এই সহানুভূতি সেদিন কোথায় ছিল রামলাল?

রামলালের মুখটা ক্রমে পাংশুবর্ণ হয়ে যায়। বলে: আর একবার তো আসতে পারতে। না এসে এই রাত্রে তুমি চুরি করতে—

: হ্যাঁ, চুরি করতেই এসেছি। লাখো চোরের সর্দার হয়ে নিজেকে সাধু বানিয়ে রেখেছ। ভেবেছ তোমার এই সাধুতার মুখোস কেউ কোনদিন খুলতে পারবে না?

অস্বাভাবিক গম্ভীর অতনুর গলাটা। রামলাল কিছুতেই তাকে শান্ত করতে পারছে না। অতনুর কাছ থেকে তাকে এমন কথা শুনতে হবে আশাও করেনি কোনদিন।

অনুনয়ের সুরে রামলাল বলে: এ কি বলছ তুমি দোস্ত! এমন জরুরী টাকার দরকার তেমন করে তুমি তো বল নি। তুমি চলে যাওয়ার পরেই আমি তোমাকে খুঁজেছিলাম। তোমার যা দরকার নিয়ে যাও। তোমরাই তো আমার বন্ধু।

সে কথা শুনে একটা তাচ্ছিল্যের হাসিতে অতনুর মুখটা ভরে যায়। রামলালকে সে ভাল করেই চেনে। সে ব্যাঘ্রের চেয়ে হিংস্র। সর্পের চেয়ে ভয়ঙ্কর। বিপদে পড়ে আজ এইসব কথা বলছে। শুনে অতনুর সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে। সে বলে: রাতের অন্ধকারে আজ যাকে বন্ধু বলে

স্বীকার করছ, কাল দিনের আলোয় তারই হাতে হাতকড়া দিয়ে হাজতে পাঠাতে তোমার বুকখানা একটুও কাঁপবে না।
বিস্ময়ে রামলাল বলে : তুমি কি পাগল হলে ?
অতনু জবাব দেয় : এখনো হইনি। সেইজন্যেই বুঝতে পারছি যাকে তুমি বন্ধু বল হয় সে তোমার ভাগ্যবিধাতা নইলে সবচেয়ে বড় শত্রু।
কাঁপতে কাঁপতেও মুখে হাসি আনবার চেষ্টা কবে পরিবেশটা হালকা করতে চায় রামলাল।
: তোমার দেখছি সত্যিই মাথা খারাপ হয়েছে। কত টাকা চাই বল।
: কিছুই চাই না। মাথাও আমার খারাপ হয়নি। নিজেব কবর তুমি নিজেই খুঁড়েছ। তোমাকে বিশ্বাস করা আর বিষাক্ত সাপ নিয়ে খেলা করা একই জিনিস।
কথাগুলো বলতে বলতে রামলালের দিকে এগিয়ে এসেছিল অতনু। রামলালের হাত-পা সর্বশবীব শিথিল হয়ে গিয়েছিল তার মূর্তি দেখে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। অতনু ট্রাউজারের পকেট থেকে ক্ষিপ্রগতিতে একটা ছোরা বার করে। পলকের মধ্যে ছোরাটা আমূল বসিয়ে দেয় রামলালের বুকে। একটা কাতর আর্তনাদ করে বিছানাব ওপর লুটিয়ে পড়ে সে।

ঘরের নীল আলোটা অসহ্য লাগছিল-অতনুর কাছে। বেড-সুইচটা টিপে আলোটা নিভিয়ে দিল সে। আলো চায় না। তার চাই অন্ধকার। আলমারিব চাবিটা রামলালের বালিশের তলায় রেখে খুব সন্তর্পণে পালিয়ে এল সে। অন্ধকার পথে নেমে কোনদিকে যাবে কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছিল না। জনহীন পথে আনমনা হয়ে চলতে থাকে অতনু।

॥ বাইশ ॥

দৈনিক খবরের কাগজের পাতায় রামলালের মৃত্যুসংবাদ ছাপা হল। শহরের প্রখ্যাত ব্যবসায়ী রামলাল গোয়েঙ্কা খুন হয়েছে। গভীর রাত্রে অজ্ঞাত আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত।

তার রহস্যজনক মৃত্যুটা বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে সমস্ত পাড়াটায়। অপরাধীর সন্ধানে তৎপব হয়ে ওঠে পুলিস। থানার অফিসার-ইন-চার্জ রজত সান্যাল নিজের হাতে তদন্তের ভার নেন। রামলালের বাড়ির সকলেব কাছ থেকে এজাহাব নেওয়া হয়। আততায়ীকে তারা কেউ দেখে নি। রাতে শোবাব আগে রামলাল শেষ দেখা করেছে বজ্রপানির সঙ্গে। তাবপব যথানিয়মে সে নিদ্রা যায়। জানলার গবাদ বেঁকিয়ে কোন লোক ঘরে ঢোকে। তাব দ্বারাই নিহত হয়েছে রামলাল। টাকাকড়ি বা জিনিসপত্র কিছুই চুবি যায়নি। তাই দেখে এটুকু বোঝা গিয়েছিল যে ব্যক্তিগত আক্রোশের বশেই কেউ তাকে খুন করেছে। চুরির উদ্দেশ্য তাব ছিল না।

পুলিস অফিসার জিজ্ঞাসা করেছিলেন এ বিষয়ে কার ওপর সন্দেহ করা যেতে পাবে। কিন্তু ভয়ে কেউ কোন নাম প্রকাশ করেনি। বজ্রপানির বিবৃতির ওপর নির্ভর করে অতনুর ওপর সন্দেহ করা হয়। অবশ্য স্পষ্ট কবে বজ্রপানি অতনুর সম্বন্ধে কিছুই সেরকম বলেনি।

সেই সংবাদের ওপর ভিত্তি করে অতনুর তল্লাস চলে। রামলালের বাগানবাড়িতে তার সন্ধান নিয়ে জানা যায় সেখানে গত পাঁচদিন সে

অনুপস্থিত। অতনুর সম্বন্ধে সন্দেহ দৃঢ়তর হয়। পলাতক অতনুকে তন্নতন্ন করে খুঁজতে যাকে পুলিস।

ওদিকে খবরের কাগজে রামলালের রহস্যজনক মৃত্যুর সংবাদটা পড়ে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল অনুরূপা। সে ভেবেছিল নানা চরিত্রের লোকের সঙ্গে রামলালের মেলামেশা। শত্রু থাকাও বিচিত্র নয়। তাদেরই কার হাতে হয়ত খুন হয়েছে। এই সব দেখে শুনে অনুরূপার ভয় লাগে। এতরকম ভাবনা আর সে ভাবতে পারে না।

সেদিন সকালে শক্তি চিত্রম্‌এর জয়-পরাজয় ছবির মহরত ছিল। সকাল থেকে মনটা খারাপ হয়ে যাওয়ায় সেখানে গেল না সে। সকালে কিছু খেতেও পাবে নি। চুপ করে খাটে শুয়ে ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে সকাল গড়িয়ে দুপুব হয়। দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ে অনুরূপা।

ঘুম থেকে যখন ওঠে তখন সন্ধ্যা সমাগত। আজ কদিন ধরে কেন জানে না মার কথা মনে পড়ছে সারাক্ষণ। পলাশডাঙা থেকে করুণার চলে আসার খবর পাওয়ার পব থেকেই তার মন খুব খারাপ হয়ে যায়। কোন কাজেই আর মন লাগে না। দুপুরবেলায় ঘুমন্ত অবস্থায় অনুরূপা সেদিন স্বপ্ন দেখেছিল মাকে। ঘুম থেকে উঠে চুপ করে বসেছিল জানালার ধারে। যুধিষ্ঠির ঘরে ঢুকে বলে : সারাদিন তো কিছু খেলে না দিদিমণি। একটু জলখাবার আনি।

মুখ না ফিরিয়ে অনুরূপা বলে : আমার খেতে ইচ্ছে নেই রে। আচ্ছা, আমাকে কেউ খোঁজ করে নি তো আজ ?

একটু ভেবে যুধিষ্ঠির বলে : উকিলবাবু ফোন করেছিলেন। আপনি ঘুমোচ্ছেন বলায় পরে সময়মত দেখা করবেন বলেছেন। আর—

: আর কি ?

: আর একটা পাগলগোছের মেয়েছেলে এসেছিল।

অনুরূপা বলে : তোরা কি করিস, ঘুমিয়ে থাকিস ? পাগলকে ঢুকতে দিয়েছিলি কেন ?

ধমক খেয়ে যুধিষ্ঠিব অপ্রস্তুত হয়ে যায়। ঘটনাটা দিদিমণির কাছে বলে সে। যে এসেছিল তার চেহারা দেখে পাগলের কোন লক্ষণ বুঝতে পারে নি সে। এক প্রৌঢ়া মহিলা কোন একটি নারী মঙ্গল সমিতি থেকে চাঁদার জন্যে আসে। যুধিষ্ঠির জানে দান করতে পারলে তার দিদিমণি খুশি হয়। সেইজন্যে দরজা খুলে সে নিচের বাইরের ঘরে মহিলাটিকে বসতে দেয়। হঠাৎ মহিলাব নজর পড়ে দেওয়ালে টাঙানো দিদিমণির একটা ছবিব ওপর। মুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে ছুটতে ছুটতে বেবিয়ে যায় সে। যুধিষ্ঠিরও ছুটে গিয়ে বলে : চলে যেও না দাঁড়াও, আমাব দিদিমণি দয়াব সুমুদ্দুর।
কোন কথা না বলে সেই মহিলা তখন গলির বাঁকে অদৃশ্য হয়েছে।

অনুরূপা দারুণ উত্তেজিত হয় এই ঘটনা শুনে। তার আর বুঝতে বাকি থাকে না, তাবই দুয়াবে করুণা এসে ফিরে গেছেন কাঁদতে কাঁদতে। যুধিষ্ঠিরেব সামনে এসে চিৎকার কবে অনুরূপা বলে ওঠে : কেন তাকে যেতে দিলি ? কেন তাকে ধরে রাখলি না ?
যুধিষ্ঠির জানে না অনুরূপার জীবনেব বিগত ইতিহাস। তার মুখে এই কথা শোনার পব দিদিমণির অস্থিরতা দেখে তার কোন মানে বুঝতে পারে না সে। নিজের মনকে প্রশ্ন করে এর কোন উত্তরও খুঁজে পায় না।
অনুরূপা চঞ্চল হয়ে বলে : ড্রাইভারকে বল আমি বেরুব।
যুধিষ্ঠির যেতে যেতে ভাবে দিদিমণিও বুঝি পাগল হবে।

গাড়ি নিয়ে সারা কলকাতা ঘুরে বেড়ায় অনুরূপা। কোন রাস্তা খুঁজতে

বাকি রাখে না সে। শহর ছাড়িয়ে শহরতলি পর্যন্ত ইতস্ততঃ ঘুরতে থাকে। মাঝে মাঝে ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করে ঃ কোন্‌দিকে যাব ?
অনুরূপা কখনও বলে সোজা কখনও ডাইনে কখনও বাঁয়ে।
এমনিভাবে ঘুরে ঘুরে যখন বাড়ি ফিরে এল তখন রাত হয়ে গেছে। অনুরূপার ভীষণ রাগ হয় নিজের ওপর আর যুধিষ্ঠিরের ওপর। যুধিষ্ঠির আর দিদিমণির কাছে আসতে সাহস পায় না।
ড্রাইভার এসে এক সময়ে মনে করিয়ে দেয় রাত সাড়ে দশটায় রেডিওতে গান আছে।
অনুরূপা তখন অন্যমনস্ক হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। তার মনের ভেতরে তখন অশান্ত সাগরের প্রবল জলোচ্ছ্বাসের গর্জন। ফিরে দাঁড়িয়ে ড্রাইভারকে বলে ঃ আমি যাব না। তুমি গাড়ি তুলে দিয়ে বাড়ি চলে যাও।
কতক্ষণ এইভাবে অনুরূপা দাঁড়িয়েছিল তার মনে নেই। এক সময়ে দেখল রাত বেশ বেড়ে গেছে। নিশুতি হয়ে গেছে চারিদিক। তখন ধীরে ধীরে ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকে সে। অপলক চোখে চেয়ে থাকে দূরের আকাশটার দিকে।
ঘুমের লেশমাত্র নেই। আজ তার নিজের জীবনের সব ছন্দ হারিয়ে গেছে। অতনুর ওপর নির্ভর করে একদিন এসেছিল ভাগ্য খুঁজে বাঁচতে। সে আজ পলাতক। রামলালের কাছ থেকে অসময়ে পেয়েছিল প্রচুর সাহায্য। সেও আজ মৃত্যুর পরপারে। তার জীবনের সামনে এই সংসার-রঙ্গমঞ্চে প্রতি মুহূর্তে হচ্ছে অভাবনীয় পট-পরিবর্তন। সুখে-দুঃখে আশায়-নিরাশায় সে দেখছে সেইসব নাটকীয় মুহূর্তগুলো। অতি কষ্টে অনুরূপা টেনে নিয়ে চলেছে তার অভিশপ্ত জীবনটা।

এইসব কথাই ভাবছিল অনুরূপা। অনেকরাতে দরজায় ধাক্কা দেয় অতনু। যুধিষ্ঠির তাকে দরজা খুলে দিতে সোজা অনুরূপার ঘরে এসে ঢোকে।

আজ তার পরনে ধুতি আর পাঞ্জাবী। সুন্দর দেখাচ্ছিল অতনুকে। নেশার ঘোরে তার চোখ দুটো স্বপ্নময়।
অতনুকে কদিন পরে এত রাতে দেখে ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে অনুরূপা উঠে বসে। প্রশ্ন করে : এত রাত্রে কী চাই এখানে ?
অতনু দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে থাকে। ধীরভাবে বলে : আজ আমার শেষ চাওয়া চাইতে এসেছি।
অতনুর কথা শুনে অনুরূপার ভয় করে। জানে না কী তার শেষ চাওয়া। গভীর রাতে কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে সে হাজির হয়েছে। সাহস সঞ্চয় করে অনুরূপা বলে : বল তোমার শেষ চাওয়া।
অতনু কাছে এগিয়ে এসে বলে : তাব আগে একটা কথা বলতে চাই। আমাব চারিদিকে পুলিস।
বিদ্রূপের তীর ছুঁড়ে মারে অনুরূপা। বলে : একদিন বলেছিলে দেশের কাজ করতে নেমেছ। এই বুঝি তোমাব দেশের কাজ ?
অতনু উত্তেজিত হয়ে ওঠে।
: ঠাট্টা রাখ। আমার সমালোচনা তোমার শুনতে চাই না। তোমার কথার জবাবদিহিও আমি করতে পারব না।
অনুরূপা কাছে এসে বলে : বাগছ কেন ? শেষ চাওয়া চাইতে এসেছ, শেষ কথা শুনতে পারবে না ?
অতনু আরও উত্তেজিত হয়ে বলে : নীতিকথা শোনবার আমার সময় নেই। আমি নৈশ অভিসারে বেরোই নি। দেরি করলে অনর্থ ঘটবে।

এত রাতে কথা কাটাকাটি অনুরূপারও আর ভাল লাগে না। বিরক্ত হয়ে বলে : তা হলে কাজেব কথা বলে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়াই ভাল। অনেক রাত হয়েছে।
: শোন, এই মুহূর্তে আমার তিন হাজার টাকা চাই।

টাকার কথা শুনে অনুরূপার রক্ত মাথায় উঠে যায়। সকালের কাগজে রামলাল খুন হওয়ার সংবাদ পড়ে মর্মাহত হয়েছে, দুপুরে চাকরের কাছে পাগলিনীর কাহিনী শুনে তার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সারাটা বিকাল রাস্তায় রাস্তায় গাড়ি নিয়ে ঘুরে সর্বাঙ্গে তার ক্লান্তি। তার ওপরে গভীর রাত্রে অতনুর এই জুলুম।

রাগে উত্তেজনায় অনুরূপা বলে : পাবে না। এক পয়সাও পাবে না। আমার কি টাকার গাছ আছে যে যখন খুশি নাড়া দেবে আর নিয়ে যাবে?

অতনু তার কথার কোন গুরুত্ব না দিয়ে বলে : টাকা আমাকে পেতেই হবে আর তোমাকেও যেমন করে হোক তা দিতে হবে।

অনুরূপা বলতে থাকে : তোমাকে আমি ভয়ও করি না আর তোমার ওপর আমার ভরসাও নেই। চোখরাঙানিটা বন্ধ কর।

অতনু আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। ড্রেসিং টেবিলটায় ঠেস দিয়ে বলে : ভুলে যেও না অনু, যারা আমার পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ায় আমি হাসতে হাসতে তাদের সরিয়ে দিই। তুমি বোধ হয় খবরের কাগজে পড়েছ অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে রামলাল খুন হয়েছে। আশা করি সেই আততায়ীকে চিনতে তোমার ভুল হচ্ছে না।

অতনুর মুখে এক ভয়ঙ্কর হাসি।

সে কথা শুনে চমকে ওঠে অনুরূপা। এতখানি সে ভাবতে পারেনি। অতনু চরিত্রহীন মত্তপ জুয়াড়ী অনেক কিছুই হতে পারে কিন্তু সে যে মানুষ খুন করতে পারে তা ছিল অনুরূপার চিন্তার বাইরে।

বিস্মিত হয়ে অস্ফুটে সে বলে ওঠে : অতনু তুমি! তোমার এই কাজ?

: হ্যাঁ। তার দরকার হয়েছিল। এখন নিজেকে বাঁচাতে আমার টাকার দরকার।

কঠিন কণ্ঠে অনুরূপা বলে : টাকা আমার নেই।

নিশুতি রাতে কেউ কোথাও জেগে নেই। কর্মব্যস্ত মানুষ তখন নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা যাচ্ছে। যুধিষ্ঠিরও নিচে ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। অনুরূপা ভাবে কী জঘন্য এই মানুষটা। আর কী অসহায় অবস্থায় কী ভীষণ দুর্বিপাকে পড়েছে সে নিজে। এক হত্যাকারী সামনে দাঁড়িয়ে আর এই গভীর রাত্রে সে কথা বলছে তার সঙ্গে। অতনুর প্রতি ঘৃণায় সে শিউরে ওঠে।

অনুরূপাকে চুপ করে থাকতে দেখে অতনু বলে: তাহলে এই অবস্থাতেই আর দেরি না করে আমার সঙ্গে চলে এস।

ঘৃণার সঙ্গে অনুরূপা জিজ্ঞাসা করে: কোন্ অধিকারে এ দাবি তুমি করতে পার?

অতনু একটু হেসে জবাব দেয়: যে অধিকারে অন্ধ গলি থেকে তোমাকে এই রাজপথে এনেছি।

পিছনে সরে এসে খাটের ধারে বসে অনুরূপা বলে: আমি যাব না তোমার সঙ্গে। তুমি কি ভেবেছ আমি কাদামাটির তাল যে যেমন ছাঁচে ইচ্ছে তেমনি ছাঁচে গড়বে আমাকে?

অনুরূপার মুখে সে কথা শুনে অতনুর রাগ বেড়ে যায়।

: বাজে কথা রাখ অনু। তোমার ভাল-মন্দের ভার একদিন আমারই হাতে ছেড়ে দিয়েছিলে। আজ কেন সরে দাঁড়াচ্ছ?

অনুরূপা বলে: মনে রেখ অতনু, আমাকে মূলধন করে তুমি বাঁচবে, সে বাঁচার সুযোগ আমি তোমায় দেব না।

এমন কঠিন কথা শুনতে হবে অতনু ভাবেনি। অনুরূপার ওপর তার আশা ছিল জোর ছিল। তার ধারণা ছিল তার কথার অবাধ্যতা অনুরূপা করবে না। সবচেয়ে বড় কথা তার ওপর অতনুর দাবি ছিল। অনুরূপার আজকের এই জন-অভিনন্দিত জীবন, এই অর্থ, এই উন্নতির জন্যে মনে মনে নিজের ওপর গর্ব ছিল তার।

সেই কথা মনে করে সে বলে : ভুলে যেও না তোমাকে একদিন আমিই বাঁচিয়ে ছিলাম।

অনুরূপা কিছুতেই সে কথাটা সহ্য করতে পারে না। এর নাম যদি জীবন হয় তাহলে মৃত্যু কী? নিজের কথা ভেবে অনুরূপা বলে : আমাকে তুমি বাঁচাও নি অতনু। মরণেব পথে ঠেলে দিতে চেষ্টা করেছ। তুমি বলবে আমি অনেক পেয়েছি। কিন্তু যা হারিয়েছি তার দাম আমার কাছে কা তা কেবল আমিই জানি।

একটা সিগারেট ধরিয়ে অতনু বলে : বুঝেছ হয়ত ঠিক কিন্তু একটু দেরিতে বুঝেছ।

অনুরূপার ক্রমশ অসহ্য লাগে। অতনুর বিদ্রূপটা জ্বালা ধরায় তার মনে। বলে : জগতে সব চেয়ে বেশি আমি ঘৃণা করি কা'কে জানো? তোমাকে।

: আমার তাতে কিছুমাত্র যায় আসে না। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে অতনু বলে। তাবপর অনুরূপাব কাছে এগিয়ে এসে সে শুরু করে : 'দাক্ষিণ্যের দুয়ারে হাত পেতে অতনু মল্লিক কোনদিন কারও কাছে গিয়ে দাঁড়ায়নি। জীবনে যা দরকাব বলে জেনেছে তা ছিনিয়ে এনেছে জোর করে। এখন বল আমার সঙ্গে যাবে কিনা?

এই জবরদস্তিতে অনুরূপা আরও বিবক্ত হয়ে ওঠে। আজই অতনুর সঙ্গে তার শেষ বোঝাপড়া হয়ে যাক। কঠিন হয়ে সে বলে : বলছি তো যাব না।

: যাবে না?

: না-না-না।

গম্ভীর হয়ে অতনু জিজ্ঞাসা করে : এই তোমার শেষ কথা?

: হ্যাঁ, এই আমার শেষ কথা।

: তাহলে মরবার জন্যে প্রস্তুত হও। অতনু জীবনে কারও কাছে হার মানে নি।

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে অনুরূপা তাকিয়ে দেখে অতনু হাতে একটা রিভলবার বার করে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে।

একটা সাময়িক উত্তেজনায় খুনের নেশা চেপেছে তার। অতনু কখনও পরাজয় বরণ করেনি। আজ সামান্য একটা নারীর কাছেও পরাজিত হবে না সে।

অনুরূপাও হার মানবে না। সে জানে তার আজকের জীবনের সামনে শুধু লোভ আছে লালসা তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। অনেক বাধা-বিঘ্ন-বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে তাকে চলতে হবে। তাকেও হার মানলে চলবে না।

অনুরূপা ছুটে যায় অতনুর কাছে। দুহাত দিয়ে চেপে ধরে রিভলবারটা। তার চোখেও তখন আগুন। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে থাকে। সে বলে : আমাকে তুমি মারতে পারবে না। বাঁচবার ইচ্ছে আমার না থাকলেও তোমার মতো একটা লোকের হাতে আমি মরতে পারব না।

রিভলবারটা নিয়ে দুজনে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। এত শক্তি অনুরূপা কোথায় পেল ভাবে অতনু! কিছুতেই তার হাত ছাড়াতে পারে না।

চিৎকার করে অতনু : হাত ছাড় বলছি।

: না, ছাড়ব না।

দুজনেই যথাশক্তি বল প্রয়োগ করে। খুব ধস্তাধস্তি হয় কয়েকটা মিনিট। তারপর হঠাৎ গর্জে ওঠে সেই মারণাস্ত্রটা। দুজনের টানাটানিতে একটা গুলি বেরিয়ে এসে লাগে অতনুর বুকে। বুকটা চেপে ধরে এক পা এক পা করে টলতে টলতে গিয়ে সোফার ওপর অতনু এলিয়ে দেয় তার দেহটা।

অনুরূপা মন্ত্রমুগ্ধের মতো কঠিন নিশ্চল। কয়েকটা মুহূর্ত সে বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। হারিয়ে ফেলেছিল তার সমস্ত অনুভূতি।

অতনুর কাছে এসে তার মাথার কাছে বসে আপনমনেই সে বলে ওঠে ঃ এ আমি কি করলাম! এ তো আমি চাই নি।

অতনুর দেহে তখনও প্রাণের স্পন্দন রয়েছে। সংজ্ঞা হারায়নি সে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার জামাকাপড়। কোনরকমে আস্তে আস্তে সে বলে ঃ তুমি ঠিকই করেছ তনু। তোমার হাতে এই শাস্তিরই দরকার ছিল আমার। আমাকে তুমি ক্ষমা করো।

অতনুর চোখে অনুরূপা এই প্রথম জল দেখল। এই প্রথম অসহায় অবস্থা দেখল তার। অনুরূপার হাতটা ধরে সে বলে ঃ আর একটা কথা তোমাকে বলি। তোমার বন্ধু জয়া, সে আমারই বিবাহিতা স্ত্রী।

কান্নায় ভেসে যায় অনুরূপার মুখখানা। জীবনে এত আশ্চর্য সে কখনও হয়নি। ছন্নছাড়া অতনুর নেপথ্যে আছে এক দুর্ভাগা নারী যে হয়ত আজও স্বামীর আসার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। তার চেয়ে আরও আশ্চর্য সে-নারী অনুরূপারই বান্ধবী। এত দিন তার কাছে এ কাহিনী ছিল লৌহযবনিকার অন্তরালে। যে মুহূর্তে অতনুর কাছে সে তা' শুনল সেই মুহূর্তে সমস্ত অনুভূতি সে হারিয়ে ফেলেছিল।

কোনরকমে সামলে নিয়ে অস্ফুটকণ্ঠে অনুরূপা বলে ঃ জয়া! তোমার স্ত্রী জয়া? আমি কী কৈফিয়ত দেব তার কাছে?

অনুরূপার মুখের দিকে অসহায় চোখ তুলে অতনু বলে ঃ কোন কৈফিয়ত দেবার দরকার নেই। আমাকে একটুকরো কাগজ দাও। আমি লিখে দিয়ে যাই স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেছি।

আঘাতে সংঘাতে জর্জরিত, ভাগ্যের সঙ্গে নিয়ত যুদ্ধ করে ক্ষতবিক্ষত অনুরূপা নিশ্চল পাথর হয়ে বসে থাকে। এতদিন যাকে শুধু ঘৃণা করেছে অ জ [illegible] দিয়ে প্রণাম করতে ইচ্ছা হল তার। মৃত্যুর কো[illegible] আশ্রয় [illegible] অতনুর ক্লান্ত দেহটা।